শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

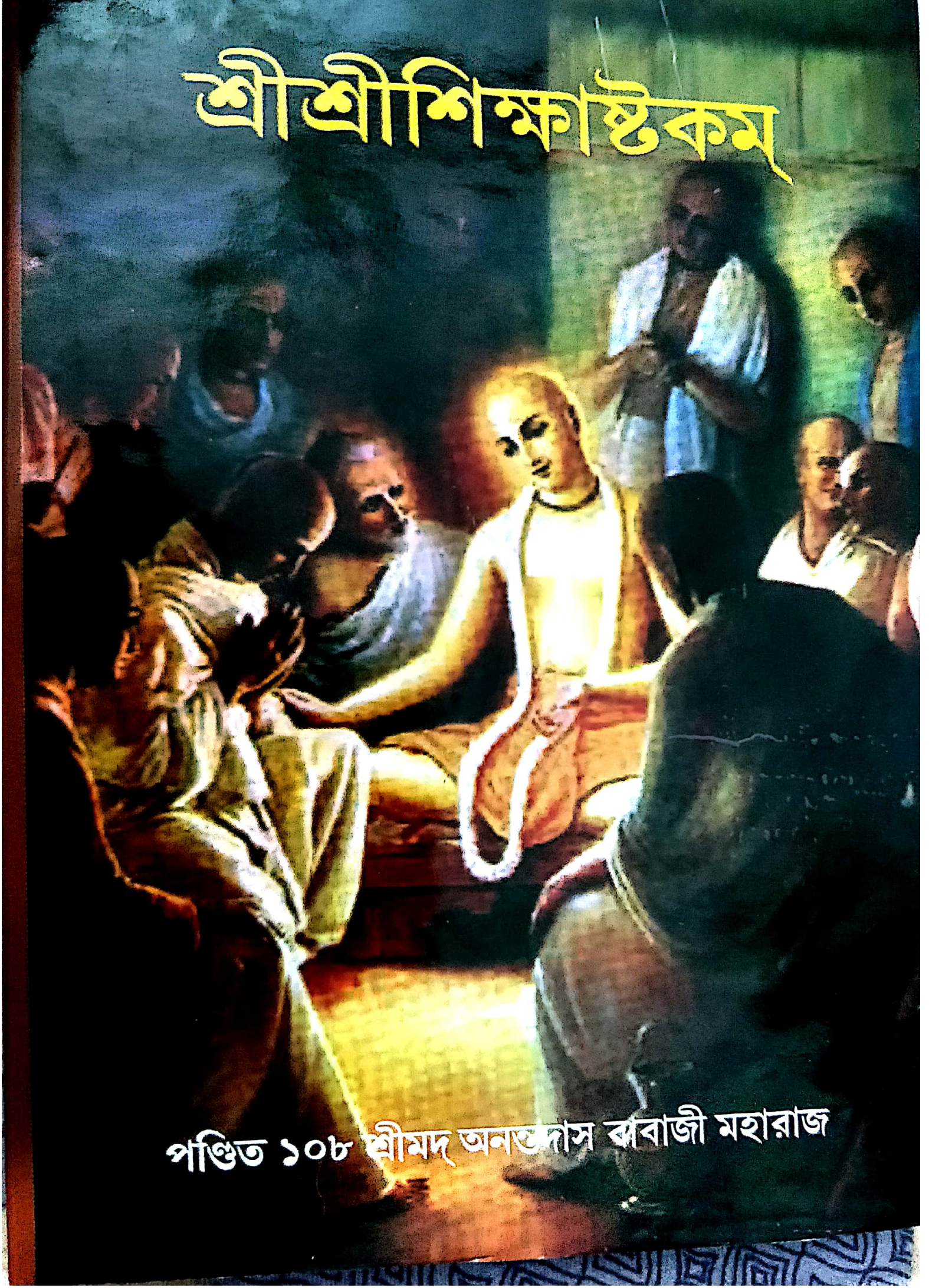

পণ্ডিত ১০৮ শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১॥

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতরণের একটি অন্যতম কারণ বিশ্বমানবকে ব্রজপ্রেম দান করে ধন্য বা কৃতার্থ করা । "নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন । আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥" (চৈঃ চঃ)। এই দুই কার্যেই তিনি প্রকটকালাবধি ব্রিব্রত ছিলেন । নদীয়ায় সংকীর্তন-প্রচারে যত্রতত্র নাম-প্রেম দান, পার্ষদগণের প্রতি আদেশ — "যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে ।" (ঐ)। সন্ন্যাসের পর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ ও ব্রজে আগমনে ভারতের সর্বত্রই প্রেম প্রদান করেন । এমন কি ঝারিখণ্ড-পথে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তুসমূহকে, বৃক্ষলতাদিকে পর্যন্ত প্রেমদানে ধন্য করলেন । অবশেষে অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে অবস্থান করে অবতরণের

Scanned with CamScanner

গূঢ়কার্য শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদনে বিহ্বল হলেন । সুতরাং পরবর্তিকালের জীবকুলের নিমিত্ত গ্রন্থাদি লিখে প্রেমপ্রচারের অবকাশ তাঁর ছিল না । একার্য তিনি শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দ্বারাই সম্পন্ন করলেন । তিনি নীলাচলে ভাবাবিষ্ট দশায় শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের নিকট স্বয়ং এই শিক্ষাষ্টক প্রকাশ করে এই আটটি শ্লোকে তাঁর প্রচারের অতি রহস্যময় বা সারাৎসার তত্ত্ব জীবজগৎকে শিক্ষা দিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ সর্ব উপদেশের সার । জীবের যা শ্রেয়ঃ, যা কাম্য, যা লক্ষ্য, যা শান্তির, যা তৃপ্তির তাই তিনি এই আটটি শ্লোকরূপ রত্নের মালা গেঁথে বিশ্বজীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে বা চৈতন্যচরিতামৃতের শেষে এই শিক্ষাষ্টকটি সন্নিবিষ্ট করেছেন ।

প্রথম শ্লোকে প্রভু বলছেন — "যা' চিত্তদর্পণমার্জনকারী, সংসার মহাদাবানলের নির্বাপক, মঙ্গলরূপ কুসুমবিকাশের চন্দ্রিকা, যা' বিদ্যাবধূর প্রাণস্বরূপ, যা' আনন্দসিন্ধুকে বর্ধিত করে, যার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন, যা' সর্বাত্মস্নপনকারী (অর্থাৎ নিখিল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সকলের পরাতৃপ্তি বিধায়ক) সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নাম-সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে বিশ্বে প্রেম প্রচার করেছেন, তা' প্রেমপ্রাপ্তির এমনি এক অব্যভিচারী মহাসাধন

Scanned with CamScanner

যে নিরপরাধ চিত্তে নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের প্রকাশ হয়ে থাকে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ বৃহদ্ভাগবতামৃতে লিখেছেন —

"নামসঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥
তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ ॥"

(বৃঃ ভাঃ-২।৩।১৬৪-১৬৫)

অর্থাৎ "নাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসম্পদ্ লাভের অন্তরঙ্গ ও অতি বলিষ্ঠ সাধন। কারণ ইহা মন্ত্রবৎ পরমাকর্ষক। তাই ভক্তিরসিকগণ নামসংকীর্তনকে ভক্তির ফল বলেও মনে করেন। কারণ নামসংকীর্তনই অব্যর্থ ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তি প্রকাশ করে থাকেন। এর কখনো ব্যভিচার হয় না।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল গোস্বামিপাদ স্বয়ং লিখেছেন — "ননু সর্ব্বেষামপি সাধনভক্তিপ্রকারণাং প্রেমৈব ফলমিত্যভিপ্রেতং সত্যং, নামসংকীর্ত্তনে সতি প্রেম্ণঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ উপচারেণ তদেব ফলং মন্যত ইতি" অর্থাৎ 'যদি কেউ বলেন — সর্বপ্রকার সাধনভক্তির ফল তো প্রেমই, নাম তো প্রেমের সাধন, তাকে সাধনের ফল কিরূপে বলা যেতে পারে ? তদুত্তরে বলা হচ্ছে — সত্যই, নামসঙ্কীর্তন অব্যর্থরূপে সেই প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করে থাকেন, অর্থাৎ নামসংকীর্তনে প্রেমোদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্ব-হেতু নামসংকীর্তনকে ভক্তির ফল বলে উপচার করা হয়েছে।'

Scanned with CamScanner

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই বলেছেন — "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন নিখিল সাধ্য ও সাধনার শীর্ষে বিরাজ করে জয়যুক্ত হচ্ছেন।' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ —

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ট নববিধ-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ — নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥" (চৈঃ চঃ)

দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদ রহিত, অধিকার অনধিকার বিবর্জিত, পরমামৃতময় শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন সাধকের সাধনাবস্থার, সিদ্ধের সিদ্ধাবস্থার সর্বপ্রকার উৎকর্ষকে আবিষ্কার করে জয়যুক্ত হচ্ছেন। মহাপ্রভু এই শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভেই বলেছেন — "হর্ষে প্রভু কহে — শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥" (চৈঃ চঃ)। ইহা স্বয়ং উপেয় হয়েও শ্রেষ্ঠতম উপায়।

'সংকীর্তন' অর্থে — সম্যক্ কীর্তন। এর দু'প্রকার অর্থ। (১) অনেকে মিলিত হয়ে শ্রীখোল-করতাল-সহযোগে উচ্চ-কীর্তনকে সংকীর্তন বলা হয়। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" (ভাঃ - ১১।৫।৩২) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন — "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভিমিলিত্বা শ্রীকৃষ্ণ-গানসুখম্" (ক্রম-সন্দর্ভঃ)। শ্রীজীব আরও বলেছেন — এই নামকীর্তন উচ্চস্বরেই বিশেষ প্রশস্ত — "নামকীর্ত্তনঞ্চোদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।"

Scanned with CamScanner

শ্রীশ্রীল গোস্বামিপাদ প্রমাণের সঙ্গে যুক্তিটিও দেখিয়েছেন — "তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তারঃ কিমুত স্বেষাম্; যথোক্তং নার-সিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন — 'তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিক বান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ'॥" ইতি (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২৬৯ অনুঃ)। অর্থাৎ "যাঁরা উচ্চস্বরে নামকীর্তন করেন, তাঁরা নিজের হিতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীমাত্রেরও পরমহিত সাধন করে থাকেন।' শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নৃসিংহের স্তুতি-প্রসঙ্গে বলেছেন — "হে ভগবন্! যে মহৎগণ উচ্চৈঃস্বরে পরমানন্দে তোমার নামকীর্তন করেন, তাঁরা সর্ব-জীবের নিরুপাধি বান্ধব বলে জানতে হবে'।" উচ্চকীর্তনের মহিমায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তি —

"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
জিহ্বা পাইয়াও নর-বিনে সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥

Scanned with CamScanner

দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে ।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনে ।।"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৪শ পরিঃ)

(২) শ্রীকৃষ্ণনামের মাধুর্য্যাস্বাদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মনঃ-সংযোগের সহিত স্নেহভরে বা প্রীতিভরে নামকীর্তনকেও সঙ্কীর্তন বা সম্যক্ কীর্তন বলা হয় । অর্থাৎ নামের ফল শীঘ্র অনুভব করতে হলে নিয়মানুবর্তিতায় সংখ্যা-পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে যন্ত্রের ন্যায় মনঃসংযোগ-বিহীন নামকীর্তন না করে প্রীতিভরে নামকীর্তনের অভ্যাস করতে হবে । শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।২০ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব লিখেছেন, "শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি, কেবলত্বেন স্নেহ-সংযুক্তত্বেন চ । তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সদ্যস্তল্লোকং তন্নাম । পরেণ চ তৎসামীপ্যমপি প্রাপয়তি । ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে । দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইতি তদ্বাক্যাৎ ।" অর্থাৎ 'শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণ দু'প্রকারে হতে পারে — (১) কেবল নাম গ্রহণ (২) স্নেহসংযুক্ত নাম-গ্রহণ । কেবল বা প্রীতিশূন্য নাম গ্রহণে নিরপরাধ ব্যক্তি সদ্যই ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু স্নেহসংযুক্ত নামে ভগবৎ-সান্নিধ্য বা ভগবৎ সেবা প্রাপ্তিও হয়ে থাকে । শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সমাগতা ব্রজগোপীগণের প্রতি বলেছিলেন — হে ব্রজসুন্দরীগণ ! আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের অমৃতত্বের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ আছে, তা' আমায় বলপূর্বক আকর্ষণ করে তোমাদের

Scanned with CamScanner

নিকটে উপস্থিত করে ।' এই ভগবদ্বাক্যে ভগবানের প্রতি স্নেহ তাঁকে আকর্ষণ করার পরম উপায় বলে জানা যায় । তদ্রূপ স্নেহপূর্বক বা প্রীতিপূর্বক নাম-কীর্তনে শ্রীনাম নামীকে আকর্ষণ করে নামোচ্চারণকারীর নিকট মূর্ত করে দেন । তাই প্রীতি-পূর্বক নামকীর্তনও সম্যক্ বা সংকীর্তন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইশ্লোকে সেই মহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনকে সাতটি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন । প্রথমতঃ বলেছেন — (১) **'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্'** শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন চিত্তদর্পণমার্জনকারী । বিষয়বাসনা-দুষ্ট সংস্কাররূপ মলে কৃষ্ণ-বহির্মুখ মানবের চিত্তদর্পণ আচ্ছাদিত থাকায় বিভু বা ব্যাপক তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণধামাদি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হন না । দর্পণ যতই সুমার্জিত হতে থাকে, ততই সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হয়ে উঠে । তদ্রূপ শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনে চিত্তদর্পণ যতই মার্জিত হতে থাকে, ততই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির মাধুরী তাতে প্রতি-বিম্বিত হয় । শ্রীহরিনাম-কীর্তনে চিত্তদর্পণ যেরূপ পরিমার্জিত হয় জ্ঞানযোগাদি সাধনায় তা কখনই হয় না ।

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্ ।
সর্ব্বপাপ-প্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥"

(পদ্মপুরাণ)

Scanned with CamScanner

'হে দ্বিজোত্তম ! অমিততেজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনেই দিবাগমে অন্ধকারের ন্যায় দুরিতরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে । শ্রীহরিনাম কীর্তন-ব্যতীত অতি সহজে জীবের সর্বপাপাদি প্রশমনের অপর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই ।" "সর্ব্ব-পাপপ্রশমনরূপং প্রায়শ্চিত্তমন্যৎ ন পশ্যামি, অন্যস্য সবাসন-পাপক্ষপণাশক্তেঃ" (টীকা শ্রীল সনাতন) । অর্থাৎ 'হরিনাম-সংকীর্তনে যেরূপ বাসনার সহিত সর্বপাপাদি প্রশমিত হয়, এমন অন্য কোন সাধনেই হয় না ।'

নিখিল সাধনার ফললাভের প্রথম বা মূল স্তরই হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি । চিত্তশুদ্ধি-ব্যতীত কোন সাধনাতেই কিছু ফললাভ করা যায় না । জ্ঞানাদি সাধন অনলের ন্যায় মলনাশের সহিত চিত্তটিকেও দগ্ধ করে ফেলে । একমাত্র নাম-সাধনা গঙ্গাজলের ন্যায় চিত্তকে ধৌত করে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে থাকে । নামকীর্তন-কারীর সহজে চিত্তশুদ্ধির অপর একটি মূল্যবান্ হেতু রয়েছে । কৃষ্ণভক্ত সাধু মহাত্মাগণ ভগবন্নামপ্রিয় । কারো মুখে ভগবন্নাম শ্রবণ করলে তাঁরা অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং নামকীর্তনকারীর প্রতি কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও বা অলক্ষিতভাবে কৃপাবর্ষণ করে থাকেন । এভাবে মহৎ কৃপায় নামে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয় এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় । অনন্তর তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়পূর্বক ভজন-সম্পদ্ লাভ করেন । ভক্তিশাস্ত্রে এই অবস্থা 'ভজনক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

(২) **'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্'** জড়ীয় বস্তুর সঙ্গে মানসসম্বন্ধ-রচনার নামই 'ভব' বা সংসার। এই সংসারজ্বালা মহাদাবাগ্নির ন্যায় মহাজ্বালাময়। দাবাগ্নিতে বা বনের অনলে যেমন বৃক্ষলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি দগ্ধ বা পরিতপ্ত হয়, তদ্রূপ এই সংসার-দাবাগ্নিতে কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকূল ত্রিতাপজ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ বা পরিতপ্ত হচ্ছে। সংসারকে দাবানলের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়ার সার্থকতা এই যে, দাবানল যেন কেউ জ্বেলে দেয় না, বৃক্ষ-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণেই এই অনলের উদ্ভব হয়; তদ্রূপ জীবের সংসারজ্বালাও দুর্বাসনা-সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তমধ্যে উদ্ভূত হয়। এই জ্বালার নিমিত্ত জীব নিজেই দায়ী, অপর কেউ দায়ী নন। কোন গুরুদেব তাঁর এক শিষ্যকে রন্ধনের নিমিত্ত নিকটস্থ পল্লী থেকে অগ্নি আনতে বল্লেন। শিষ্য অগ্নি অন্বেষণ করেও না পেয়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন — 'অগ্নি আনতে আর কোথায় যাবে সে ?' গুরুদেব ভাবলেন এত অপদার্থ, একটু অগ্নি আনার সামর্থ্য নেই। তাই রাগ করে বল্লেন, — 'যা যমের বাড়ী থেকে আগুন নিয়ে আয়।' শিষ্য সরল প্রাণ, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য উৎকণ্ঠিতপ্রাণে যমের বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। যম মহারাজ গুরুভক্ত শিষ্যের উৎকণ্ঠা দেখে স্থির থাকতে না পেরে তাঁকে নিজ নিলয়ে আনয়ন করলেন। শিষ্যটি গুরুর আজ্ঞা যম মহারাজের নিকট নিবেদন করে আগুন চাইলেন। যম মহারাজ বল্লেন — 'বৎস ! এখানে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই। এখানে

Scanned with CamScanner

প্রতিনিয়ত আগুনে অনেক দগ্ধ হচ্ছেন বটে, কিন্তু সে অনল তাঁরা নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন এবং নিজের আনা অনলে নিজেই দগ্ধ হচ্ছেন। তাই সে অনল অন্যের কাজে আসে না।' কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে স্বকৃতকর্মের ফলস্বরূপ সংসার-বহ্নিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতে হয়। তাই একে দাবালনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যখন দাবানলে বা বনবহ্নিতে বৃক্ষলতাদি দগ্ধ হয়, তখন কোথাও পালিয়ে তারা সে বহ্নির তাপদাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাপে জ্বলে পুড়ে মরা-ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীব ত্রিতাপ-জ্বালায় অহর্নিশি দগ্ধ হলেও স্বয়ং কোনও প্রতিকারের দ্বারা এতাপ হতে বিমুক্তি লাভ করতে পারে না। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকুলের শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখতা-ব্যতীত ত্রিতাপ-জ্বালা শান্তির আর উপায়ান্তর নেই। প্রচুর মেঘের জল বর্ষণ-ব্যতিরেকে ভীষণ দাবানলের যেমন অন্য কোন উপায়েই নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ নামসংকীর্তনরূপ মেঘের জল-ব্যতিরেকে ত্রিতাপানলের শান্তি বা নিবৃত্তি হয় না। নামমাধুর্য-বর্ষণে জীবের সর্বপ্রকার জড়ীয় সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং চিৎস্বরূপ ভগবৎ-দাসাভিমানে সে চিরতরে ত্রিতাপজ্বালা থেকে বিমুক্তি লাভ করে। ভক্তিশাস্ত্রে "অনর্থ-নিবৃত্তি" নামক যে সাধনস্তরের কথা বলা হয়েছে এবং সাধনভক্তির যে "ক্লেশঘ্নী" গুণের কথা উল্লেখ করা

Scanned with CamScanner

হয়েছে এই 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্' বিশেষণে তাও নির্দেশিত হল জানতে হবে।

(৩) **'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্'** শ্রেয়ঃ অর্থে মঙ্গল, কৈরব অর্থে কুমুদ এবং চন্দ্রিকা মানে জ্যোৎস্না। নাম-সংকীর্তন জীবের মঙ্গলরূপ কুমুদ-বিকাশে জ্যোৎস্নার ন্যায়। জ্যোৎস্না যেমন স্বীয় আলোক-বিতরণে কুমুদকুসুমকে প্রফুল্লিত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তনে মানবের মঙ্গলরূপ কুমুদ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠে। এই শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল কি ? শ্রুতিতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দু'টি বস্তুর বিষয় লিখিত আছে —

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥"
(ক্যাঠকে-১।২।২)

অর্থাৎ "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃষ্টরূপে বিচারদ্বারা ভিন্নরূপে এদের তত্ত্ব অবগত হন। জ্ঞানিগণ প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকেই বরণ করেন, আর মন্দমতিগণ যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বিষয়সুখ প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়সুখের রক্ষণা-বেক্ষণ) কামনায় প্রেয়ঃকেই গ্রহণ করে থাকে।" 'শ্রেয়ঃ' বা মঙ্গল বলতে এখানে ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে — 'শ্রেয়ঃসৃতিং

Scanned with CamScanner

ভক্তিম্ (ভাঃ)। 'শ্রেয়ঃ' শব্দটি সামান্যতঃ মঙ্গল, কল্যাণ, অভ্যুদয় প্রভৃতি অর্থবাচক হলেও ভগবদ্দাস জীব যদ্দ্বারা ভগবৎসেবা লাভ করতে পারে শুদ্ধ জীবের পক্ষে তাই যথার্থ শ্রেয়ঃ। দেহ-দৈহিকাদির শুভাশুভের প্রতি যতদিন আবেশ থাকবে, ততদিনই জীবকে অমঙ্গলময় সংসারাবর্তে পড়ে নানা-যোনীতে ভ্রমণ করতেই হবে। কৃষ্ণনামসংকীর্তন মানবের দেহ-দৈহিকাদির আবেশ বিনষ্ট করে তার পরম শ্রেয়ঃরূপ ভক্তি-সাধন-কুমুদে চন্দ্রিকা-বিতরণ-করত তাকে সুবিকশিত করে থাকে।

পূর্বোক্ত 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্' বিশেষণে অনর্থনিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এই অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নামসাধনে সাধকের নিশ্চলা স্থিতি লাভ হয়। সাধক-হৃদয়ে তখনি 'মঙ্গল-মঙ্গলানাং' অর্থাৎ 'নিখিল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভক্তিসাধনারূপ কুমুদ স্বয়ংই সুবিকশিত হয়ে উঠে। অর্থাৎ সাধক শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দন, স্মরণাদি ভক্তিঅঙ্গে নিষ্ঠা ও রুচি লাভে ধন্য হন। সুতরাং এই বিশেষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধন-সোপানসমূহের মধ্যে নিষ্ঠা ও রুচিকে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি সাধন-ভক্তির 'শুভদা' গুণেরও সূচনা করেছেন বলে জানতে হবে।

(৪) **'বিদ্যাবধূজীবনম্'** — শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন বিদ্যা-বধূর প্রাণস্বরূপ। 'বিদ্যা' কাকে বলে ? দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্যযোগ (জড় ও চেতনের বিবেক), অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা প্রভৃতিকে

Scanned with CamScanner

বিদ্যা বলা হলেও সাধারণতঃ বিদ্যা শব্দটি বেদন পর্যায়বাচী। 'বিদ' ধাতুর অর্থ জানা, সুতরাং বিদ্যা শব্দে জ্ঞানকেই বুঝায়। এজ্ঞান বা বিদ্যা সাধকের সাধনানুযায়ী নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান এবং সবিশেষ ভগবদ্‌জ্ঞানরূপে তাঁদের চিত্তে আবির্ভূত হয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর ন্যায় বৈচিত্রীশূন্য এবং সবিশেষ ভগবদ্‌জ্ঞান তরঙ্গ সমাকুল সিন্ধুর ন্যায় নানাবৈচিত্র্যে পূর্ণ। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নির্ণিমেষ দৃষ্টির ন্যায় বৈচিত্রীহীন, সবিশেষ ভগবদ্‌জ্ঞান অপাঙ্গবীক্ষণের ন্যায় সরস ও অতি বিচিত্র ভগবদনুভূতিময়। এই উভয়বিধজ্ঞান বা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন। নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানসাধনাও শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তন-ব্যতীত নিষ্প্রাণ। কারণ "ভক্তি-বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন — "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" যদ্দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে মতি বা বুদ্ধির নিশ্চলা স্থিতি লাভ হয় তাই বা ভক্তিই যথার্থতঃ 'বিদ্যা'। এবিদ্যা বা ভক্তিকে বধূর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, বধূ যেমন কোমল-স্বভাবা, স্নিগ্ধা, সেবাপরায়ণা, মধুর হাস্যময়ী — কথায় বলে 'নববধূ অমৃত-সমান' — নববধূ যেন সবার দৃষ্টিতে অমৃতের ন্যায় মধুরা, তদ্রূপ ভক্তিও সর্বদা মধুরাদপি মধুর-স্বভাবা। প্রাণ থাকলেই সব শোভা পায়, প্রাণ না থাকলে যেমন সবই ব্যর্থ, তদ্রূপ নাম-সংকীর্তন-বিহীন ভক্তিসাধনাও ব্যর্থ বা নিষ্প্রাণ। বিদ্যা বা ভক্তিরূপ বধূ তাঁর জীবনীশক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্তন-

Scanned with CamScanner

সাহায্যে সাধকের রুচিকে বর্ধিত করে আসক্তি-স্তরে উন্নীত করে থাকেন এক্ষেত্রে এটিও বোদ্ধব্য ।

(৫) **'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্'** — শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তন আনন্দসিন্ধুকে পরিবর্ধিত করে থাকে । নানা দিগ্‌দেশবর্তি নদ-নদীর জল অহর্নিশি সিন্ধুতে প্রবেশ করলেও সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না, কিন্তু আকাশে যখন পূর্ণিমার চন্দ্রের উদয় হয়, তখন সিন্ধু বিশাল তরঙ্গরাজিতে সমুচ্ছ্বসিত হয়ে বেলাভূমি আপ্লাবিত করে দেয় । তদ্রুপ বিশ্বে আনন্দলাভের নানা উপকরণ থাকলেও তা' কখনো ভক্তের হৃদয়ে আলোড়ন জাগায় না; শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনে কিন্তু তাঁদের আনন্দসিন্ধু অনন্ত তরঙ্গে সমুচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে । নাম-নামী অভিন্ন বিবক্ষায় নামী শ্রীভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যের অফুরন্ত আস্বাদন নামের মধ্যে নিহিত রয়েছে । মিছরী স্বভাবতঃ মিষ্ট-পদার্থ হলেও পিত্তদুষ্ট জিহ্বা যেমন মিছরীর আস্বাদন পায় না, সেই জিহ্বায় মিছরী তিক্ত বলেই বোধ হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই অসীম আনন্দপূর্ণ হলেও অপরাধদুষ্ট জিহ্বায় তার আনন্দরূপতার অনুভূতি জন্মে না । তাই বলে নামকীর্তনে আনন্দ নেই, তা' বলা যায় না । যা' আমাদের শক্তিহীন ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয় না, তার অস্তিত্ব নেই, একথা যুক্তিহীন । বিজ্ঞানাচার্যেরা বলেন — আকাশে এমন সব তারকারাজি আছে, যার আলোক এখনো পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছায় নি । তাই বলে তার অস্তিত্ব নেই, একথা কিরূপে বলা

Scanned with CamScanner

যায় ? কেননা যাঁরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখেছেন তাঁরা দেখছেন ওগুলো আছে। তদ্রূপ যেসব মহতের চিত্ত এবং জিহ্বা অপরাধ-শূন্য ও নির্মল তাঁরা নামানন্দ আস্বাদনে ধন্য হচ্ছেন। তাঁদের আনন্দাস্বাদনই তার প্রমাণ। তাই শ্রীমৎ জীবগোস্বামীপাদ লিখেছেন — "অতএবানন্দরূপত্বমস্য মহদ্ধুদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য' অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্তির ন্যায় ভগবন্নামেরও আনন্দরূপত্বাদি বিষয়ে মহতের অনুভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।' ভক্তই অনুভব করেন — "কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥" (চৈঃ চঃ)। অভক্ত অসুরেরা আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনেও এমনকি মল্লক্রীড়া-কালে চাণুর-মুষ্টিকাদি অসুরেরা সেই আনন্দঘনবিগ্রহের নিবিড় স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েও আনন্দের বিনিময়ে দুঃখ বা যাতনাই পেয়ে থাকে। তদ্রূপ চিদানন্দরসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণনামের আস্বাদনও অপরাধীর বা অভক্তের জিহ্বায় অনুভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন আনন্দসিন্ধুকে বর্ধিত করেন। এখানে আনন্দ বলতে ভাবানন্দকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধক রুচিস্তরে অবস্থান করে নামকীর্তনে যে আনন্দ আস্বাদন করেন, আসক্তিস্তরে সেই আনন্দ বর্ধিত হয়ে ক্রমশঃ ভাব বা রতিস্তরে পৌঁছিলে ঐ আনন্দ অপার অনন্ত পারাবার তুল্য হয়ে উঠে। নামও চন্দ্রধর্ম প্রকাশ-করত ঐ আনন্দসিন্ধুকে নিয়ত পরিবর্ধিত করতেই থাকেন।

Scanned with CamScanner

ভাবচন্দ্রোদয়ে আনন্দসিন্ধু এতই সমুচ্ছ্বসিত হয় যে, মোক্ষানন্দও তুচ্ছবোধে তিরস্কৃত হয়ে থাকে। এতাদৃশ ভাবদশা লাভ করা সহস্র সাধনেও সুদুর্লভ। সুতরাং এই বিশেষণে ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত রতিদশার 'মোক্ষানন্দ-লঘুতাকৃৎ' ও 'সুদুর্লভা' এদুটি গুণের কথাও ব্যঞ্জিত হয়েছে।

(৬) **'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'** — হরেকৃষ্ণাদি নামকীর্তনের প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়ে থাকে। প্রতিপদে তো বটেই নামের প্রতিটি অক্ষরেও পূর্ণামৃতের আস্বাদন নিহিত রয়েছে। মহাপ্রভু 'জগন্নাথ' নামটি উচ্চারণ করতে পারছেন না, 'জজ গগ জজ গগ গদগদ বচন'। (চৈঃ চঃ) এখানে পূর্ণামৃত বলতে সবিশেষ ভগবদ্রসানন্দ বা প্রেমানন্দের কথাই জানতে হবে। প্রেম স্বয়ং পূর্ণামৃত এবং পূর্ণামৃত-স্বরূপ ভগবদ্রসানন্দ আস্বাদনের কারণ। এবিশ্বে যেমন অমৃত-অপেক্ষা স্বাদুবস্তু আর কিছুই নেই, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেম অপেক্ষা বা প্রেম যে ভগবদ্রসানন্দ আস্বাদন করায় তা' অপেক্ষা অধিক স্বাদু আর কিছুই নেই। জ্ঞানাদির সাধ্য ব্রহ্মা-নন্দাদিও অপূর্ণ, কারণ তাতে আস্বাদনের বৈচিত্রী বা চমৎকৃতি নেই। পরিশেষে আস্বাদ্য, আস্বাদন ও আস্বাদক এক হয়ে যাওয়া। সুতরাং তা' অপূর্ণ।

প্রেমের উদয়ে যখন নামকীর্তন চলতে থাকে, তখন নাম-কীর্তন, শ্রবণ, স্মরণে প্রতিপদে পদেই কৃষ্ণস্ফূর্তি হতে থাকে, তখনি ভগবদ্রসাস্বাদনটি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। প্রেমপূর্ণ চিত্তে

Scanned with CamScanner

নামানুবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হয়ে থাকে, যার ফলে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটে। এতে প্রেমের "সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা" ও "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী" দুটি গুণের কথাও ব্যক্ত হল।

(৭) **'সর্ব্বাত্মস্নপনম্'** — তখন ভগবানের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সায়রে নামসাধকের সর্বেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত অশেষ-বিশেষে অভিস্নাত হতে থাকে। জিহ্বায় আহার্যবস্তুর সেবনে যেমন সর্বেন্দ্রিয়ের ও মন-বুদ্ধি প্রভৃতির পরিপুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ নামসংকীর্তনদ্বারা সর্বেন্দ্রিয়ই আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে থাকে। জিহ্বায় নামোচ্চারণে বাগিন্দ্রিয় আনন্দরসে নিমজ্জিত হয়, কর্ণে শ্রবণমাত্রেই নামরসে কর্ণেন্দ্রিয় মগ্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে নামরস মনে উদিত হওয়ায় মন, বুদ্ধি, আত্মা নামানন্দরসের পাথারে ডুবে যায় !! আবার আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল তৃষ্ণা বা পিপাসা উদিত হয়ে অধিকতর আস্বাদনের লালসা বিবর্ধিত করতে থাকে। তখন মনে হয় —

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

(বিদগ্ধমাধব)

অর্থাৎ "যা' জিহ্বায় উচ্চারিত হয়ে বহু জিহ্বা লাভের নিমিত্ত বাসনা জাগায়, কর্ণে অঙ্কুরিতা হয়েই (অর্থাৎ ঈষৎ

Scanned with CamScanner

স্পর্শমাত্রেই) অর্বুদসংখ্যক কর্ণলাভের নিমিত্ত ইচ্ছা উৎপাদন করে, যা' চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়ে সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারকে স্তিমিত করে দেয়, জানিনা 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় কত প্রভূত অমৃতদ্বারা রচিত হয়েছে।" "কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু'আখর করি।" (যদুনন্দন ঠাকুর)। অনাদিকাল থেকে এই সংসার-মরু-কান্তারে ভ্রাম্যমান্, প্রতিনিয়ত ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবের দেহ, মন, প্রাণ ও সর্বেন্দ্রিয়ের প্রতিটি অনু-পরমাণুকে পরমানন্দরসে আপ্লুত করতে পারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামামৃতরস। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥"

(বৃঃ ভাঃ-২।৩।১৬২)

"নামামৃতরস একটিমাত্র বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হয়ে স্বীয় মাধুর্যরসে সমুদয় ইন্দ্রিয়কেই আপ্লাবিত করে থাকে।" এরূপে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন প্রতিনিয়ত সর্বোৎকর্ষে বিজয়লাভ করছেন। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" জীব যতই পাপতাপাদির চরমস্তরে পৌঁছাক না কেন, দীনজন-বিষয়ে পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্তনেই তারা সর্ববিধ কল্যাণ লাভ করে অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম এবং তাঁর প্রেম-সেবানন্দ লাভ করে ধন্যাতিধন্য হয়ে থাকে। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর রামানন্দরায়ের নিকট

Scanned with CamScanner

নান্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

হে ভগবন্! তুমি নিজের বহু নাম প্রচার করেছ, ঐসব নামে আবার নিজের সর্বশক্তি অর্পণ করেছ, শ্রীনামের স্মরণাদি বিষয়ে কোন কালের নিয়ম করনি; এতাদৃশ তোমার করুণা । কিন্তু আমার এমনি দুর্দৈব যে, তোমার এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না ।

অখিল ভক্তিরসময় অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামকীর্তনের সর্বোৎকর্ষ-সূচক প্রথম শ্লোকটি পাঠ করলেন । নামমাধুর্যের স্মৃতিতে ভক্তির অতৃপ্তি স্বভাববশতঃ প্রভুর মনে হল — 'নামের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের কত করুণা ! কিন্তু হায় ! আমি সেই নাম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত । এমন কৃষ্ণনামে আমার অনুরাগ জন্মিল না ।' চিত্তটি প্রভুর দৈন্য ও বিষাদে সমাচ্ছন্ন হল । তাই

শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-মাধুরী স্বয়ং আস্বাদন করে আমাদের নিমিত্ত অবশেষ রেখেছেন মহাপ্রভু —

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে — পাপ-সংসার-নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদগম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥"১ ॥

Scanned with CamScanner

পরতত্ত্বের চরমসীমা হয়েও অনর্থযুক্ত সাধকের ভূমিকায় নেমে এসে শিক্ষাষ্টকের এই দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"উঠিল বিষাদ দৈন্য পঢ়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥" (চৈঃ চঃ)

এইশ্লোকের অর্থ শুনলে আমাদেরও দুঃখ-শোক দূরীভূত হবে। দুঃখ-শোক যাবে অর্থে শ্রীহরিনামে প্রীতির সঞ্চার হবে, যার ফলে আনুষঙ্গিকভাবেই সাংসারিক দুঃখ-শোকাদি দূর হবে। অথবা দুঃখ-শোক বলতে নামে অনুরাগ বা প্রীতি সঞ্চারিত না হওয়ার যে দুঃখ বা শোক তা' যাবে। কারণ এই দ্বিতীয় শ্লোকে একদিকে যেমন নামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল ও বিপুল করুণার কথা বলা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি এত করুণাময় শ্রীনামে প্রীতি বা অনুরাগ না হওয়ার হেতুটিও ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমাদের প্রণিধাণপূর্বক শ্রবণ করতে হবে।

মানবের সংস্কারানুরূপ তাদের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন। "ভিন্নরুচিহি লোকাঃ"। "অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।" (চৈঃ চঃ)। তাই সকলের ভগবানের কোন একটি নামে রুচি বা লোভ নাও হতে পারে। বিশেষতঃ সাধকের নিজ ইষ্টদেবের নামেই রুচি বা প্রীতি হওয়া স্বাভাবিক। তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ অনন্ত অবতারের অনন্ত নাম প্রচার বা প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, বামনাদি নামের মধ্যে যে নামে যাঁর

Scanned with CamScanner

রুচি, তিনি সেই স্বপ্রিয় নাম কীর্তন করবেন । কৃষ্ণ, রামাদি মুখ্যনাম ছাড়াও শ্রীভগবানের নানা অবতারের জন্মগত, কর্মগত, গুণগত ও লীলাগত বহু নাম আছে । যেমন জন্মানুরূপ নাম — যশোদানন্দন, নন্দকুমার, দাশরথি ইত্যাদি । কর্মানুরূপ নাম — গোবর্ধনধারী, পূতনামোক্ষণ, কংসারি, রাবণারি প্রভৃতি। গুণানুরূপ নাম — দয়াময়, ভক্তবৎসল ইত্যাদি । লীলানুরূপ নাম — দামোদর, রাসবিহারী প্রভৃতি । শ্রীকৃষ্ণের এই সকল নামের মধ্যে যাঁর যে নামে রুচি, তিনি সেই স্বপ্রিয় নাম কীর্তন করলে চিত্তশুদ্ধি ক্রমে প্রেমলাভ ও শ্রীভগবচ্চরণ-সেবা লাভ করে ধন্য হবেন । স্বপ্রিয় নামকীর্তনের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত রয়েছে —

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ।।"
(ভাঃ-১১।২।৪০)

অর্থাৎ "এইভাবে ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠানপরায়ণ ভক্ত স্বপ্রিয় ভগবন্নাম কীর্তন করতে করতে প্রেমোদয়বশতঃ দ্রবিতচিত্তে বিবশ হয়ে উন্মত্তের ন্যায় কখনো হাস্য করেন, কখনো রোদন করেন, কখনো গান, কখনো বা নৃত্য করতে থাকেন ।" এই শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ যা' লিখেছেন, তার সারমর্ম এই যে, স্বপ্রিয় নাম-কীর্তনে ভক্তের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার

Scanned with CamScanner

হয়, তখন এই বিশ্বের দৃশ্য তাঁর সম্মুখ থেকে অপসারিত হয়ে যায়। তিনি অহর্নিশি শ্রীভগবান্ এবং তাঁর মনোহরলীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হয়েই হাস্য, রোদনাদি করে থাকেন। যেমন ভক্ত স্ফুরণে দেখছেন — শ্রীকৃষ্ণ ননী-চুরি করতে কোন গোপীর গৃহে প্রবেশ করেছেন। বৃদ্ধা গোপী টের পেয়ে — 'ননী-চোরকে ধর ধর' বলে ছুটে আসছেন। তাঁর চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন — এই হাস্যোদ্দীপক লীলাটি দেখে ভক্ত হাসছেন। শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করলে স্ফুরণে তাঁকে না দেখে রোদন করছেন। প্রিয় ভক্তের রোদন-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ আবার স্ফুরণে দর্শন দিলে আনন্দ-বিহ্বল ভক্ত তাঁর রূপ, গুণাদি গান করতে করতে আনন্দ-বিবশদশায় নৃত্য করছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের রাগানুগা-ভজনেও — যাতে স্বাভীষ্ট-লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানই মুখ্যতম ভজনাঙ্গ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, তাতেও স্বপ্রিয় নামকীর্তনদ্বারা উক্ত অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গ-গুলি উজ্জ্বলীকৃত হয়ে উঠে বলে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ বৃহদ্ভাগবতামৃতে সিদ্ধান্ত করেছেন —

"তদ্ধি তত্তদব্রজক্রীড়া-ধ্যানগানপ্রধানয়া।
ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বলম্ ॥"

(বৃঃ ভাঃ-২।৫।২১৮)

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে যে সকল স্ব-স্ব প্রিয়নাম কীর্তনের দ্বারা ভক্ত প্রেমলাভে ধন্য হয়ে থাকেন, সেই সকল নামেরই মহিমা কি সমান ? শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যায়, শ্রীভগবানের নাম

Scanned with CamScanner

শ্রীভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই হিসাবে তাঁর সকল নামই সমান, তথাপি নামমাহাত্ম্যের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ-নামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারা যায়।

নাম ও নামী যখন অভিন্নতত্ত্ব **'অভিন্নত্বাৎ-নাম-নামিনোঃ'** তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের নামাপেক্ষা যে সমধিক মহিমাসম্পন্ন হবেন, এতে আর সন্দেহ কি ? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনের প্রতি বলেছেন, "নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ ।" 'হে অর্জুন ! আমার কৃষ্ণনাম অন্যান্য সকল নামের মধ্যে মুখ্যতম ।'

শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে মৎস্য, কূর্মাদি সকল অবতার-অপেক্ষা শ্রীনৃসিংহের এবং শ্রীনৃসিংহ-অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের পরাবস্থার কথা শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যায় । নাম ও নামী অভিন্ন বলে শ্রীরামচন্দ্রের নাম বিষ্ণুর অন্যান্য নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে পদ্মপুরাণাদিতে বর্ণিত রয়েছে। পদ্মপুরাণে শ্রীমন্মহাদেব ভগবতী দুর্গার নিকট বলেছেন — সকল দেবতার নাম-অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর নাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ । আবার বিষ্ণুর সহস্র নাম-অপেক্ষাও রামনাম অধিক মহিমাময় । "রামো রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥" আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয় — "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ । একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥" অর্থাৎ "শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করলে যে ফল হয়, একবার

Scanned with CamScanner

শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে জীবের সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে — "রামনাম তারক করে মুক্তিদান। কৃষ্ণনাম পারক করে প্রেমদান ॥" তাই কোন ভক্ত মহাত্মা বলেছেন — "বৃন্দাবন সে বন নহি, নন্দগাঁও সে গাঁও, বংশীবট সে বট নহি, কৃষ্ণনাম সে নাম ॥" এই শ্রীকৃষ্ণনামে সকল নামের মূল আছে। তাই প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে — "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন — **'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা'** শ্রীভগবান্ তাঁর নামে স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। পূর্বে ভগবন্নামে তাঁর শক্তি দেওয়া ছিল না, পরে শক্তি অর্পণ করলেন, তা' নয়। নামে নিত্যকালই তাঁর সর্বশক্তি নিহিত রয়েছে। কারণ নাম ও নামীতে কিছুমাত্র ভেদ নেই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখেছেন, নাম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ বর্ণরূপী অবতার। "অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি" (ভগবৎসন্দর্ভঃ-৪৮)। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।" (চৈঃ চঃ)। নাম যখন সাক্ষাৎ ভগবদবতারই, তখন তাঁতে শ্রীভগবানের সর্বশক্তি নিত্যই রয়েছে। শক্তি অর্পণের কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে মহাপ্রভু শক্তি অর্পণের কথা বল্লেন কেন? জীব-জগতের নামের থেকে শ্রীভগবন্নামের যে বিপুল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা' জানাবার জন্যই শক্তি অর্পণের কথা বলা হল।

শ্রীজীব লিখেছেন — "মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি" (ভগবৎসন্দর্ভঃ-৪৬)।

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ "মনোগ্রাহ্য পদার্থকে ব্যবহারে আনয়নের নিমিত্ত কোন সাঙ্কেতিক শব্দবিশেষকে নাম বলা হয় ।" যেমন 'জল' বল্লে পিপাসা নিবারক তরল পদার্থকে বুঝায় । কিন্তু যতক্ষণ জলপান না করা যায়, ততক্ষণ 'জল জল' জপ বা কীর্তন করলে পিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসার শান্তি হয় না । কারণ বিশ্বের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামেই নামীর গুণ নেই, নাম কেবল নামীকে সঙ্কেত করে দেয় মাত্র । যদি কেউ শ্রীভগবানের নামকেও এমনি মনে করেন, তাই বলেছেন — "নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" । শ্রীভগবান্ নিত্যকাল তাঁর নামে নিজের সর্বশক্তি নিহিত রেখেছেন । জলের যদি শক্তি থাকত — যে 'জল' জপ করবে তারও পিপাসা নিবৃত্তি করার, তবে জল নিজনামে সে শক্তি অর্পণ করতে ছাড়ত না । কারণ বিশ্বে নিজের মহিমা ব্যক্ত করতে সকলেই চায় । কিন্তু বিশ্বে কোন ব্যক্তি বা বস্তুরই সেই শক্তি নেই । শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য-মহাশক্তিমান্ তাই নিজনামে নিত্যকাল সর্বশক্তি নিহিত রেখেছেন । সুতরাং শ্রীভগবানের নামসমূহ নামী শ্রীভগবানের নির্দেশক শব্দ সঙ্কেতমাত্রই নন, শ্রীনাম শ্রীভগবান্ হতে অভিন্ন বলে ঐশ্বর্য, মাধুর্যাদির সহিত ভক্তবাৎসল্য, কারুণ্যাদি অখিল কল্যাণগুণ বা নিজ সর্বশক্তি তদীয় অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামে পূর্ণরূপে বিরাজ করছেন নিত্যকাল ।

শ্রীনামে নামীর যে সর্বশক্তি অর্পণের কথা বলা হল, শ্রীভগবানের শক্তির ন্যায়ই কি নামে তাঁর সর্বশক্তির অভিব্যক্তি

Scanned with CamScanner

হয়, না কিছু তারতম্য বা ইতর-বিশেষ আছে ? শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামী তাঁর নামাষ্টকে লিখেছেন —

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ।।"৬

"হে শ্রীনাম ! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যানন্দাত্মক কৃষ্ণ-বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি বর্ণাত্মক তোমার এই স্বরূপদ্বয় বিশ্বে প্রকাশ পাইতেছেন । আমি কিন্তু তোমার বাচ্যস্বরূপ-অপেক্ষা বাচকস্বরূপ বা নাম-স্বরূপকেই অধিকতর সদয় বলে জানি । কারণ যে ব্যক্তি বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে কৃতা-পরাধ, তিনি তোমার বাচকস্বরূপ নামোচ্চারণ-পূর্বক অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন ।" এতদ্বারা শ্রীনামে নামী-অপেক্ষা কারুণ্যাদি গুণের বা শক্তির অধিকতর অভিব্যক্তির কথা জানা গেল ।

যেমন শ্রীভগবন্নামে তাঁর বিভুতাদি ঐশ্বর্যশক্তির অভিব্যক্তি — একদা তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে কে অগ্রপুজ্য হবেন এ নিয়ে দেবতাগণের মধ্যে বিতর্ক চলছিল । ব্রহ্মা সব দেবগণকে আদেশ দিলেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে সর্বাগ্রে আমার নিকট আসতে পারবেন, তিনি সকলের অগ্রপূজ্য হবেন । ব্রহ্মার আজ্ঞা পেয়ে সব দেবতাই ব্রহ্মাণ্ড-পরিক্রমা করতে বেরিয়ে পড়লেন আপনাপন বাহনে চড়ে । গণেশের দেহটি স্থূল, বাহনটিও

Scanned with CamScanner

ছোট্ট একটি ইঁদুর । তিনি সব শেষে ধীরে ধীরে বিষণ্ণমনে যাচ্ছেন । দৈবাৎ তাঁর দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । দেবর্ষি বলছেন, 'ঠাকুর ! আপনি এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে আজ কোথায় যাচ্ছেন ?' গণেশ বল্লেন — 'দেবর্ষি ! আপনি কি কিছুই শোনেন নি ? আজ ব্রহ্মা আদেশ দিয়েছেন, দেবগণের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে তাঁর নিকট পৌঁছাবেন তিনিই সর্বদেবতার অগ্রপূজ্য হবেন । আমার দেহটাও স্থূল বাহনটিও নগণ্য একটা ইঁদুর, আমিই সবার শেষে পড়ে গেলাম ।' দেবর্ষি বলছেন — 'গণেশ ঠাকুর ! আপনি কি অগ্রপূজ্য হতে চান ?' গণেশ বলছেন — 'দেবর্ষে, বলুন এ কে না চায় !' 'তবে আসুন আমার সাথে'। দেবর্ষি গণেশকে নিয়ে ব্রহ্মার নিকট চল্লেন । বল্লেন — আপনি ব্রহ্মার আগে 'কৃষ্ণ' নামটি লিখে সাতবার পরিক্রমা করে বসে থাকবেন, তারপর যা করার আমি করব । গণেশজী তাই করলেন । দেবতাগণ ক্রমে ক্রমে সকলে আসতে লাগলেন । এখন সবার নিকট ঘোষণা করবেন ব্রহ্মা কে অগ্রপূজ্য । ইত্যবসরে শ্রীনারদ ব্রহ্মার সম্মুখে গিয়ে বল্লেন — 'পিতঃ ! আপনি স্বয়ং বেদবক্তা, শাস্ত্রের মর্ম সবই জানেন । আপনি জানেন শ্রীভগবানের নাম-নামী অভিন্ন । শ্রীকৃষ্ণনামে শ্রীকৃষ্ণের বিভুতাদি ঐশ্বর্য নিত্যই বিরাজ করছে । আপনার সম্মুখে গণেশ শ্রীকৃষ্ণনামকে সাতবার পরিক্রমা করেছেন । শ্রীভগবানের এক-একটি লোমকূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড গবাক্ষের ত্র্যসরেণুর মত ঘুরছে । সুতরাং অন্যান্য দেবতা একটি ব্রহ্মাণ্ডকে একবার

Scanned with CamScanner

পরিক্রমা করেছেন, আর ইনি সবার পূর্বে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে সাতবার পরিক্রমা করেছেন । ব্রহ্মা আর 'না' বলতে পারলেন না । স্বীকার করলেন গণেশই দেবগণের অগ্রপূজ্য হবেন । সুতরাং শ্রীভগবানের বিভুতাদি ঐশ্বর্যশক্তি শ্রীনামের মধ্যে এতই সহজভাবে নিহিত রয়েছে যে, যেকোন অযোগ্য ব্যক্তিও তা' গ্রহণ করতে পারেন ।

শ্রীনামে শ্রীভগবানের মাধুর্যশক্তির অভিব্যক্তির কথা প্রথম শ্লোকে 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্' ইত্যাদির আলোচনায় জানা গেছে । স্কন্দপুরাণে বর্ণিত — "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গল-মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।" অর্থাৎ 'কৃষ্ণনাম মধুর হতেও সুমধুর, সমস্ত মঙ্গল-অপেক্ষাও সুমঙ্গল, নিখিল বেদকল্পলতার অতি উপাদেয় ফল এবং চিদেক-স্বরূপ।" শ্রীজীব লিখেছেন — একই সচ্চিদানন্দরসময়তত্ত্ব স্বয়ং কৃষ্ণ ও তাঁর নাম এই দুইরূপে আবির্ভূত — "একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্ ।" শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী ও বেণুমাধুরীর ন্যায়ই কৃষ্ণনামের মাধুর্য আস্বাদন করেছিলেন শ্রীরাধারাণী পূর্বরাগদশায় । ললিতাদি সখীগণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি —

"সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি ;
কুলবতী তিন-পুরুখে ভেল আরতি —
জীবন কিএ সুখ লাগি ।

Scanned with CamScanner

পহিলে শুনলু হম্ 'শ্যাম' দুই আঁখর,
তৈখনি মন চুরি কেল ।
না জানিএ কো ঐছে মুরলী আলাপই,
চমকই শ্রুতি হরি নেল ।
না জানিএ কো ঐছে পটে দরশায়লি, —
নবজলধর জিনি কাঁতি ।
চকিত হইয়া হম্ যাঁহা যাঁহা ধাবই,
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি ।
গোবিন্দদাস কহে শুন সুন্দরি,
অতএ করহ বিশোয়াস ।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর, —
পটে ভেল সো পরকাশ ।।"

শ্রীনামের পতিতপাবনত্ব শক্তির অভিব্যক্তি — মহাপাতকী অজামিল মৃত্যুকালে ভয়ঙ্কর যমদূতগণকে দেখে ভয় পেয়ে রক্ষার জন্য তার প্রিয় পুত্রকে ডাকছে — 'নারায়ণ আয় !' ভগবানকে ডাকছে না, পুত্রের নাম নারায়ণ তাকে ডাকছে । "অজামিল পুত্রে বোলায় বলি নারায়ণ । বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন ।।" (চৈঃ ভাঃ)। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী নিশ্চয় জানেন সে তার পুত্রকে ডাকছে, তবু নামের অক্ষরগুলির সাম্য আছে বলে বিষ্ণুদূতকে পাঠিয়ে যমদূতের বন্ধন ছাড়িয়ে মহা-পাতকী অজামিলকে রক্ষা করছেন । এইপ্রকার পতিতপাবনত্বগুণ নামস্বরূপব্যতীত অন্য কোন স্বরূপে প্রকাশ পায়নি । কেবল

Scanned with CamScanner

বন্ধনমোচনই নয়, শ্রীনাম বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণা দিচ্ছেন — 'এখন অজামিলের আত্মাকে বৈকুণ্ঠে আনবে না। তোমাদের মুখে সে নামমহিমা শুনেছে এরপর প্রীতির সহিত নামকীর্তন করবে, তাতে শ্রীঘ্রই প্রেম পাবে, তখন তাকে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করা হবে। কারণ প্রেম-বিনা আমার সেবাপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।' ধন্য নামের পতিতপাবনী কৃপা।

তদ্রূপ ভক্তবাৎসল্য, কারুণ্যাদি গুণের অভিব্যক্তি — রাজর্ষি ভরত হরিণ-চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগানন্তর হরিণ-জন্মলাভ করলেন। শ্রীনামের করুণায় জাতিস্মর হলেন, অনুতাপে খিন্ন হতে লাগলেন, কোন হরিণের সঙ্গে মিশলেন না। যখন সেই হরিণদেহ ত্যাগ করছেন তখন ভক্তবৎসল করুণাময় শ্রীনাম তাঁহার জিহ্বায় স্বয়ংই উদিত হলেন। মানুষের জিহ্বারই হরিনাম উচ্চারণ করার যোগ্যতা আছে, পশুর জিহ্বায় তা' নেই। কিন্তু স্বপ্রকাশ হরিনাম কৃপা করেই উদিত হলেন। নামের কৃপায় হরিণদেহ ছেড়ে তিনি ব্রহ্মর্ষি হয়ে জন্মালেন। এ সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতেরই উপাখ্যান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন — **'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ'** 'হে ভগবন্! এই নাম স্মরণে অর্থাৎ শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি ভজনে তুমি কোন কালাকালের নিয়ম করনি। যে কোন ব্যক্তি, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় তোমার নাম-কীর্তন করতে পারেন।' শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে

Scanned with CamScanner

শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর স্কন্দপুরাণাদির প্রমাণ উদ্ধৃত করে নামকীর্তনাদিতে যে কালাদির নিয়ম নেই তা' প্রমাণিত করেছেন —

"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা ।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরির্নাম্নি লুব্ধক ॥
ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে ।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্ ॥"

অর্থাৎ "নাম-কীর্তনাদি সম্বন্ধে দেশকালের কোন বিচার নাই, উচ্ছিষ্টমুখে বা উচ্ছিষ্ট স্থানেও নাম-ভজন করা যায় । নাম দেশ, কাল, অবস্থা এবং শুদ্ধি আদির অপেক্ষা রাখেন না, সর্বাবস্থায় নামভজন সর্বাভীষ্টপ্রদ ।" আরও বলা হয়েছে —

"স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা ।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥" (ঐ)

"যাঁরা খেতে, শুতে, চলতে, উঠতে, বসতে, কথা বলতে হরিনাম করেন, তাঁদিগে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।" শাস্ত্র ও মহাজনেরা মন্ত্রজপ, সেবা, অর্চনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান-নিমিত্ত যেমন স্নান, শুদ্ধবস্ত্র পরিধানাদির অপেক্ষা রেখেছেন, নাম-স্মরণাদির নিমিত্ত তাদৃশ শুদ্ধাশুদ্ধির কোন বিচার দেখা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন — **'এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ'** 'হে ভগবন্ ! তোমার শ্রীনামের দ্বারে এতাদৃশ অসাধারণ করুণা, কিন্তু

Scanned with CamScanner

আমারও দুর্দৈব এরূপ প্রবল যে, তোমার এমন নামে আমার অনুরাগ সঞ্জাত হল না ।' 'দুর্দৈব' শব্দের অর্থ দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য প্রভৃতি । নাম-সাধকের সেই দুর্দৈব বা দুরদৃষ্ট ও মন্দভাগ্য কি ? শাস্ত্র ও মহাজনবাণীর থেকে জানা যায় একমাত্র নামাপরাধ-ব্যতীত নামের বিশাল মহিমাকে প্রতিহত করতে পারে, নাম-সাধকের বিশ্বে এমন অন্য কোন দুর্দৈবই নেই ।

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ।।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগাশ্রুধার ।।
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন ।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ।।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবে যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ।।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ।।"

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন হতে পারে, নামের মহিমা যখন এতই নিরঙ্কুশ, তখন আবার অপরাধের বিচার কেন ? অপরাধ যদি নামের মহিমাকে প্রতিহত করে, তবে নামের নিরঙ্কুশতা থাকে কোথায়? 'উত্তরে বলা হয়েছে, কুজ্ঝটিকা স্বপ্রকাশ সূর্যকে আবরিত

Scanned with CamScanner

করতে পারে না, আমাদের নেত্রকেই আচ্ছন্ন করে। কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে কোটী কোটী যোজন দূরে বিরাজমান। আমাদেরই আচ্ছন্ন করে কুজ্‌ঝটিকা, তাই আমাদের উপর সূর্যরশ্মি নিপতিত হতে পারে না। তদ্রূপ নামের স্বপ্রকাশ মহিমাকে আচ্ছন্ন করার শক্তি বা সাধ্য কাহারো নেই, কিন্তু নামাপরাধ আমাদের চিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, স্বপ্রকাশ নামের মহিমাও প্রতিহত হয়ে চিত্তে নিপতিত হতে পারে না। কুজ্‌ঝটিকার অপগমেই যেমন সূর্যকিরণ অবাধে আমাদের উপর নিপতিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ অপরাধের অপগমে সাধকের চিত্তে নামের অকুণ্ঠ প্রভাব অনুভূত হয়। যেমন কোন রাজরাজেশ্বরের যে কোন দরিদ্র-ব্যক্তিকে ধনদানে ধনাঢ্য করার ক্ষমতা সবসময়েই রয়েছে। কিন্তু রাজা যদি কারো প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন, তাকে তিনি ধন-দানের ইচ্ছাই করেন না, তাই বলে তাঁর ধনদানের শক্তি নেই, একথা তো বলা যায় না। তদ্রূপ নামাপরাধীর উপর শ্রীনামের অপ্রসন্নতাহেতু যেকোন মূহূর্তে প্রেমদানের সামর্থ্য থাকলেও শ্রীনাম নামাপরাধীকে তা' দেন না বা দেবার ইচ্ছা করেন না। তাই সাধকগণকে নিরপরাধ হয়েই নামসাধনা করতে হয়। কারণ বহুকাল নাম-ভজনেও অপরাধীর চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না। এজন্যই ভক্তিশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ অপরাধরূপ দুর্দৈব-বর্জনের নিমিত্ত সাধকগণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

দুর্দৈব বা অপরাধের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে যে প্রীতির বিরোধী বা প্রতিযোগী দ্বেষভাবাত্মক গর্হিত কার্যই সমস্ত অপরাধের মূল। এই দ্বেষভাব অহঙ্কার-মূলক বলে প্রীতিযোগ্য মহাপুরুষগণের মধ্যে এবং প্রীতির আশ্রয়ভূত সাধকের মধ্যে এমন এক ব্যবধান-সেতু রচনা করে যে, তার ফলে মানব অধম হয়েও নিজেকে উত্তম মনে করে, অজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞ মনে করে, নিজের দোষ ও অন্যের গুণ দেখতে পায় না; তাই নিজের শ্লাঘা করে এবং অন্যের নিন্দা চর্চাদি করে থাকে। এরূপ পরশ্রীকাতর সাপরাধ ব্যক্তিরা বৈষ্ণবের উৎকর্ষ দেখলেও সহ্য করতে পারে না, মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকেও সামান্য মনুষ্য মাত্র মনে করে এবং নাম-মহিমাদি শ্রবণেও তাতে বিশ্বাসস্থাপন করতে পারে না, সেসব মিথ্যা মনে করে। তার মিথ্যাভাষণ, পরহিংসন, পরদ্রব্যাদি অপহরণ প্রভৃতি পাপজনক কার্যগুলি মাৎসর্যরূপ কাপট্যের অন্তরালে থেকে গুরুতর অপরাধ সৃষ্টি করে। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, আমরা সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

(১) **সাধুনিন্দা** — সাধুনিন্দা গুরুতর অপরাধ, একে মহদপরাধও বলা হয়। এখানে ভগবদ্ভক্ত মাত্রই সাধু-শব্দের বাচ্য। যাঁদের দ্বারা শ্রীনাম বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করছেন, তাঁদের নিন্দা তিনি কিরূপে সহ্য করবেন ? অনেকে মনে করেন, কোন

Scanned with CamScanner

সাধু যদি নিন্দনীয় কার্য করেন, তার সমালোচনা করলে কোন দোষ হয় না, কারণ সেটি তো সত্য কথা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামী লিখেছেন — "নিন্দনং দোষ-কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ দোষ কীর্তন করলেই তাকে নিন্দা বলা হবে, তাতে সত্য-মিথ্যার কোন প্রশ্ন নেই। যে সাধুভক্তের নিন্দায় নামাপরাধ বা মহদপরাধ হয়, সেই সাধুভক্ত কারা ? — এরূপ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁর মাধুর্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে এই প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন — 'এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে না যে, কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই শাস্ত্র সাধু বলে নির্দেশ করেছেন, সুতরাং তাঁদের নিন্দা করলেই অপরাধ হয়ে থাকে, যাঁরা ঐসকল গুণসম্পন্ন নন, তাঁদের নিন্দায় কোন অপরাধ হয় না। বস্তুতঃ যাঁরা ভগবদ্ভজন করে থাকেন, তাঁরা যদি সদাচার বর্জিত, শঠবুদ্ধি, জগদ্বঞ্চকও হন তবু তাঁরা সাধু বলে পরিগণিত হবেন এবং তাঁদের নিন্দা করলেও নামাপরাধ হবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শ্রীমুখে বলেছেন —

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ।।" (৯।৩০)

"যিনি অনন্যভাবে ভজনপরায়ণ হয়ে আমার উপাসনা করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচার বিশিষ্টও হন, তবু তাঁকে সাধু বলে মানবে, কারণ তিনি উত্তম অধ্যবসায়-বিশিষ্ট।"

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভজনের দ্বারাই কৃতার্থ হব, এরূপ যাঁর অনন্যভাব, তিনি যদি দেবতান্তরের উপাসনা না করে সাক্ষাৎ-ভাবে পরমেশ্বরের ভজন করেন, তিনি দুরাচার হলেও সাধু; তাঁর নিন্দা করলেও অপরাধ হবে।"

(২) **শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের স্বাতন্ত্র্য মনন** — যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হতে শ্রীশিবের গুণ-নামাদির পৃথক্ দর্শন বা স্বাতন্ত্র্য-মনন করে, সে নামাপরাধী। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু এক স্বতন্ত্রশক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং শিবও তেমনি এক স্বতন্ত্র ঈশ্বরতত্ত্ব, এরূপ মনে করলে বহ্বীশ্বরবাদ এসে পড়ে; তাতে নামাপরাধ হয়। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, শ্রীশিবাদি শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কর; এভাবেই ভক্ত বৈষ্ণবেরা শিবতত্ত্বের চিন্তনাদি করে থাকেন।

(৩) **গুর্ববজ্ঞা** — শ্রীগুরুকে অবজ্ঞা বা মনুষ্যবুদ্ধি করলে অপরাধ হয়। শ্রীভগবানের কারুণ্যঘনবিগ্রহই শ্রীগুরু। তরল-জল যেমন অধিকতর শৈত্যে জমাট বেঁধে বরফাকৃতি ধারণ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের করুণাই জীবোদ্ধার-সংকল্পের শৈত্যে ঘনীভূত হয়ে গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ। সৎশিষ্য এভাবেই গুরুতত্ত্বকে চিন্তন মননাদি করে থাকেন। সুতরাং শিষ্য সতত শ্রীগুরুরূপ চিন্ময়তত্ত্বের সদগুণাবলীই চিন্তন করবেন। শ্রীগুরু-দেবের দিব্যবিগ্রহের স্বভাব-জনিত বা ঔপাধিক দোষাদির প্রতি শিষ্য দৃষ্টি দেবেন না, তাতে গুরুদেবে মনুষ্য বা মর্ত্যবুদ্ধি আসবে এবং শ্রীনাম তার প্রতি প্রসন্ন হবেন না।

Scanned with CamScanner

(৪) **শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা** — শ্রুতিশাস্ত্র অপৌরুষেয়। "বেদয়তীতি বেদঃ" অর্থাৎ 'যিনি নিজেই নিজের জ্ঞাপক বা স্বপ্রকাশ তাঁরই নাম বেদ।' শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদানুগত শাস্ত্রও স্বপ্রকাশ। ইতিহাস-পুরাণাদির দ্বারা বেদের অর্থ সুস্পষ্ট বা পরিপূরিত হয়েছে, সুতরাং তাঁদেরও বেদত্ব আছে। এসব শাস্ত্রের নিন্দায় নামাপরাধ হয়।

জ্ঞান ও কর্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলও পরম করুণাপরায়ণ। তাঁরা ভক্তির অনধিকারী কর্ম-জ্ঞানের সংস্কারাচ্ছন্ন মানবগণকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে ক্রমশঃ ভক্তিমন্দিরে আনয়নের নিমিত্ত প্রয়াসশীল, সুতরাং ঐ সকল শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা করলে নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

(৫) **নামমহিমায় অর্থবাদ মনন** — শ্রীহরিনামের যেসব অতুলনীয় মহিমার কথা শাস্ত্র ও মহাজনবাণীতে দেখা যায়, তা' কেবল স্তুতিবাক্য মাত্র — এরূপ মনে করা। বাস্তবিক-পক্ষে শ্রীনামের যে সব মহিমা শাস্ত্র ও মহাজনগণ প্রকাশ বা কীর্তন করেছেন, শ্রীনামের অনন্ত মহিমাসিন্ধুর তা' বিন্দুমাত্রই। কেননা, নামের মহিমা অনন্ত, সহস্রবদন অনন্তদেব পর্যন্ত সহস্রমুখে বর্ণনা করে যাঁর পার পাননি, কোন দিন পাবেনও না; সেই শ্রীনামের যথাকথঞ্চিৎ মহিমাযুক্ত শাস্ত্রবাক্যকেই অর্থবাদ মাত্র (অর্থাৎ নামের এরূপ মহিমা নেই, তবে লোকের নামে প্রীতি-শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই শাস্ত্র এরূপ কীর্তন করেছেন) মনে করা কিরূপ অপরাধজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। এটি

Scanned with CamScanner

বৈষ্ণবতার বিঘাতক। অর্থবাদের প্রয়োজন কেবল বিধিশেষত্বে এবং অপ্রাপ্ত অর্থ-সম্বন্ধেই বিধির প্রয়োজন হয়ে থাকে। নাম স্বতঃই স্বতন্ত্র স্বপ্রকাশতত্ত্ব, নামের মহিমা প্রকটন-বিষয়ে বিধির কোন অপেক্ষা নেই। সুতরাং নাম-মহিমায় অর্থবাদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(৬) **প্রকারান্তরে শ্রীহরিনামের অর্থকল্পনা** — শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে নামমহিমা-সূচক যে সকল বাণী আছে, শ্রীহরিনামের সেই সেই মাহাত্ম্যের গৌণত্ব প্রতিপাদন করার নিমিত্ত অন্যপ্রকার অর্থকল্পনা। এটিও বৈষ্ণবতার বিঘাতক গুরুতর অপরাধ। অপ্রাকৃত চিন্ময়বস্তুর তত্ত্বগ্রহণে আমাদের বুদ্ধি সর্বথা অপারগ। সুতরাং যা' বুঝতে পারি না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করব না বা সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করব — এরূপ নাস্তিকতা ভাল নয়। যখন আমাদের বুদ্ধি অপ্রাকৃত হবে, অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অতীত হবে, তখনি অপ্রাকৃত চিন্ময়-বস্তুর তত্ত্ব-গ্রহণে সক্ষম হবে। আমরা এজগতে মণি, মন্ত্র, মহৌষধাদির যে অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে থাকি, কিরূপে তাদের তাদৃশ শক্তি হল; আমরা বিচারের দ্বারা তা' নির্ণয় করতে পারি না। যখন প্রাকৃত বস্তুর শক্তিই আমাদের বুদ্ধির গোচর নয়, তখন অপ্রাকৃত হরিনামের মহিমাই বা কেমন করে আমাদের বুদ্ধিগোচর হবে ? সুতরাং অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কযোজনা করতে নেই। যা' প্রকৃতির অতীত তাই অচিন্ত্য।

Scanned with CamScanner

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

(৭) **নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি** — শাস্ত্রে দেখা যায় — শ্রীহরিনাম উচ্চারণ-মাত্রেই মানবের নিখিল মহাপাতক, অতিপাতকাদি প্রজ্জ্বলিত অনলে তূলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। নামের বলে পাপসমূহ ধ্বংস হয়, এই মনে করে যদি নাম-সাধক ইচ্ছাপূর্বক পাপকার্য করেন, তবে তাহা 'ভয়ঙ্কর অপরাধজনক হয়ে থাকে। যে নাম অনায়াসে পরম-পুরুষার্থ প্রেমসাধন করে ভগবৎ-সেবানন্দদানে সাধককে ধন্য বা কৃতার্থ করে থাকেন, সেই নামের বলে ঘৃণ্যাস্পদ পাপকার্যে মতি হলে তাতে চরম দৌরাত্ম্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এতে শ্রীনামকে নিকৃষ্ট করা হয় বলে অনুষ্ঠিত পাপও কোটী কোটী গুণ অধিক অপরাধজনক হয়ে থাকে। এর প্রায়শ্চিত্তরূপে যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করলেও বা দণ্ডদাতা বহু যমরাজকর্তৃক বহুকাল যমযাতনা ভোগ করলেও তার শুদ্ধি ঘটে না।

(৮) **অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত শ্রীহরিনামের সমতা মনন** — ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা একটি ভয়াবহ অপরাধ। এটি শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে প্রমাদ, অর্থাৎ শ্রীনামের মাহাত্ম্যকে খর্ব করা হয় বলে এটি অপরাধমধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

(৯) **শ্রদ্ধাহীনজনকে নামোপদেশ** — যে নাম শুনিতে বা নাম করিতে অনিচ্ছুক, তাকে নামোপদেশ করলে অপরাধ হয়। এতে উপদেশকের অপরাধ প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ এই অবজ্ঞাদিরূপ অপরাধ উপদেষ্টাকেই স্পর্শ করবে।

(১০) **নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেও নামে অপ্রীতি** — এবাক্যে উপদেশ্য পুরুষের অপরাধের কথা বলা হয়েছে। কারণ তাদৃশ ব্যক্তি দেহ-দৈহিকাদিতে 'আমি আমার' এই অভিমানের প্রাবল্যে নামে প্রীতিযুক্ত না হয়ে বিষয়ভোগাদিতে প্রমত্ত হয়ে শ্রীহরিনামে অনাদরযুক্ত বলে অপরাধী।

নামের মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ। পাপক্ষয় সংসারমুক্তি সবই গৌণফল মাত্র। শ্রীনাম কেবল অপরাধেরই বিচার করেন; সুতরাং অপরাধ ত্যাগ করে নিরন্তর নাম-গ্রহণে পূর্বকৃত নামাপরাধ বা দুর্দৈব হতে বিমুক্তি লাভ করে সাধক প্রেমলাভে ধন্য হয়ে থাকেন। নামাপরাধ ক্ষয়-সম্বন্ধে পদ্ম-পুরাণের উপদেশবাণী —

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি ॥"

অর্থাৎ "নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধরাশি নামদ্বারাই দূর হয়ে থাকে। অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণের ফলেই নামাপরাধের ক্ষয় হয়।" জ্ঞানপূর্বক যদি কোন মহদপরাধ হয়ে থাকে, তবে সেই মহতের চরণে ক্ষমা প্রার্থনাদ্বারা সেই মহতের প্রসন্নতাতেই

Scanned with CamScanner

মহদপরাধ দূর হয়। যদি কেউ মনে করেন, যখন নিরন্তর নাম করলে নামই সব অপরাধ ক্ষয় করবেন, তখন তার কাছে এত নিকৃষ্ট হয়ে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন কি ? তা' হলে নিরন্তর নাম-কীর্তনেও সেই মহদপরাধ যায় না, বরং ঐ অপরাধ আবার ঘনীভূতই হয়ে থাকে। আবার শাস্ত্রে যেসব সেবাপরাধ দেখা যায়; অজ্ঞাতে কৃত ঐসব সেবাপরাধ নিত্যই নামকীর্তনে প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি সেবাপরাধ নামকীর্তনে বিনষ্ট হয় জেনে বুদ্ধিপূর্বক সেবাপরাধ করেন, তখন তা' আর সেবাপরাধ না থেকে নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তিরূপ ভয়ঙ্কর নামাপরাধই হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞাত-অজ্ঞাত সব অপরাধ অনুতাপের সহিত নিরন্তর নামকীর্তনে প্রশমিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য এই যে — "ভক্তিদেবীর আশ্রয় নিলেই আমার অপরাধাদি নিশ্চয় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং নামকীর্তনের ফলে আমার ভক্তি লাভ হবে" — এপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধা, আদর ও অনুতাপের সঙ্গে শ্রীহরিনামের আবৃত্তিকে 'শ্রদ্ধাবৃত্তি' বলা হয়। অপরাধ-ক্ষয়ের নিমিত্ত শ্রদ্ধাবৃত্তির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁর হৃদয়ে অপরাধ-ক্ষয়ের জন্য আগ্রহ ও অনুতাপ জন্মেছে, তিনিই শ্রদ্ধাবৃত্তি করবার অধিকারী। যার আদৌ অনুতাপ নেই, তার অপরাধ ক্ষয় হবে কি প্রকারে ? অপরাধ ক্ষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ এবং অপরাধ ক্ষয় হচ্ছে না বলে আর্তির সহিত শ্রীনামের শরণাপন্ন হয়ে অনুক্ষণ নামকীর্তন করলে নাম প্রসন্ন হয়ে যথাকালে অপরাধ ক্ষয় করে প্রেমদানে ধন্য করে থাকেন।

Scanned with CamScanner

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নামপ্রেমের মূর্তি হয়েও তাঁর নিজের নামে অনুরাগ নেই বলে বিশ্বসাধকগণকে অনুরাগময় নামভজন-জীবন-যাপনের ইঙ্গিত করলেন। সাধকের নাম-ভজনটি অনুরাগময় হওয়া চাই। শ্রীনামে নামী শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্যাদির অখণ্ড আস্বাদন নিহিত রয়েছে। কিন্তু নামাপরাধী মাদৃশ জীব তার কিছুই অনুভব পায় না, তাই নাম-ভজনটি অনুরাগময় বা উৎকণ্ঠাময় হতেও পারে না। যন্ত্রের ন্যায় মুখে কেবল নামের আবৃত্তি চলতে থাকে, আর বিষয়-বাসনা-দুষ্ট মন স্বচ্ছন্দে অবাধে বিষয়-কাননে ভ্রমণ করে বেড়ায়। কখনো বা পাপ-কার্যাদির চিন্তা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফলতঃ হাতে মালাঝুলি ও মুখে সংখ্যা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের কথা, বিষয়-বৈষয়িকের আলোচনা, এমনকি পরনিন্দা, পরচর্চাদিও অবাধে চলতে থাকে। কার্যতঃ 'ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি।' সুগতি না হয়ে বিগতি বা দুর্দৈবই সার হয়ে থাকে। সাধক প্রথম থেকে নামরসের আস্বাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধুসঙ্গে নিরপরাধে নামকীর্তনে নামের কৃপায় অনায়াসে অনুরাগময় ভজন-জীবন লাভ করে ধন্য হয়ে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এশ্লোকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন —

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।

Scanned with CamScanner

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকটি প্রকাশের পূর্বে শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দরায়ের নিকট বল্লেন —

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায় ।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ-রামরায় ॥" (চৈঃ চঃ)

"তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচ হয়ে, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে নিজে অমানী হয়ে অন্যকে সম্মান দিয়ে সর্বদা হরিকীর্তন করবে ।' শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় শেষ অধ্যায়ে এশ্লোকটি উদ্ধৃত করেই বলেছেন —

"ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক — ।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥"

বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে গেলে সাধারণতঃ বক্তা উপরের দিকে দু'হাত তুলে উচ্চস্বরে কথাটি বলে থাকেন । ঊর্ধ্ববাহু দেখে সকলের মনোযোগ

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ ॥"২॥ (চৈঃ চঃ)

Scanned with CamScanner

আকৃষ্ট হয় এবং সকলেই কথাটি শুনে থাকেন । তদ্রূপ নিখিল নামসাধকগণকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, নামসূত্রে গেঁথে শ্লোকটিকে মালার মত গলায় পরতে হবে । এ-ছাড়া নামকীর্তনে ফললাভ সুগম হবে না ।

তাৎপর্য এই যে, পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হল, অপরাধ-ব্যতীত নামের অকুণ্ঠ শক্তিকে ব্যাহত করে এমন আর কোন অনর্থই নেই । শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই দুর্দৈব বা নামাপরাধের কথা বলেই এশ্লোকটি পাঠ করে বিশ্বকে শিক্ষা দিলেন, শ্রীহরিনামে ফললাভের একমাত্র ব্যাঘাতক নামাপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীহরিনাম-কীর্তন করা ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বৈষ্ণবনিন্দাদি অপরাধকে মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন । কোমলা ভক্তিকল্পলতাকে ঐ মত্তহস্তী সমূলে ছিন্ন করে দেয় । তাই দৈন্যের আবরণ দিয়েই ঐ ভক্তিলতাকে রক্ষা করতে হয় এছাড়া উপায়ান্তর নেই ।

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ।
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদগম ।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"দীনতা-মানদত্তাদি শিলাক্ষুণ্ণ-মহাবৃতিঃ ।
ভক্তিকল্পনুভিঃ পাল্যা শ্রবমাদ্যাম্বু-সেচনৈঃ ।।"

Scanned with CamScanner

"দৈন্য এবং অপরকে সম্মান-প্রদানরূপ সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের আবরণ দিয়ে ভক্তিকল্পলতাকে আবরিত রাখতে হবে, যাতে অপরাধরূপ মত্তহস্তী তাকে দেখতে না পায় ।"

'দৈন্য' বলতে দীনতাকে বুঝায় । নিজেকে সর্বথা অযোগ্য ও অসমর্থবোধ করাই প্রকৃত দৈন্য । শ্রীমৎ সনাতন গোস্বমি-পাদ দৈন্যের লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন —

"যেনাসাধারণাশক্তাধমবুদ্ধিঃ সদাত্মনি ।
সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতেঽপি স্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্যমিষ্যতে ।।
যয়া বাচেহয়া দৈন্যং মত্যা চ স্থৈর্য্যমেতি তৎ ।
তাং যত্নেন ভজেদ্বিদ্বাংস্তদ্বিরুদ্ধানি বর্জ্জয়েৎ ।।"

(বৃঃ ভাঃ-২।৫।২২২ ও ২২৩)

অর্থাৎ "যে ভাব চিত্তে উদিত হলে সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিজেকে অসাধারণ অসমর্থ ও অধম-বুদ্ধি হয়ে থাকে, বিজ্ঞজন তাকেই 'দৈন্য' বলে থাকেন । অতএব যাতে ঐ দৈন্য চিত্তে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিমান্ সাধক বাক্যদ্বারা, চেষ্টাদ্বারা এবং বুদ্ধির দ্বারা তদনুরূপ আচরণ করবেন, তার বিরুদ্ধ আচরণ সর্বতোভাবে বর্জন করবেন ।"

'যদ্দ্বারা সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজেকে অধম অপকৃষ্ট বলে মনে করেন' — এবাক্যে বুঝা যাচ্ছে, এদৈন্য সাধারণ দৈন্য নয়। এটি পরম সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত শরণাগত সাধকের স্বরূপাবির্ভাবের স্বাভাবিক অবস্থা । ভাগ্যবান্ মানব

Scanned with CamScanner

সদগুরু-কৃপায় ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে যখন ভজনপথে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন যতই তাঁর ভগবদ্দাসাভিমান জাগরিত হতে থাকে, ততই ক্রমশঃ মায়িক-দেহের অভিমানরূপ অন্ধকার অপসারিত হয়ে সর্বত্রই ভগবানের কর্তৃত্বের অনুভূতি আসে ।. পরিশেষে শ্রীভগবানের কর্তৃত্বসিন্ধুতে নিজের সমুদয় মায়িক কর্তৃত্ব বিসর্জন দিয়ে ভগবচ্চরণে পূর্ণ শরণাগত ভক্তসাধক জীবন্মুক্তি-দশা লাভ করেন । দেহস্থিতিকাল পর্যন্ত সাংসারিক লোকের সঙ্গে আলাপ বা আদান-প্রদান সময়ে ব্যবহারিক কার্যে নিজের কর্তৃত্বের লেশমাত্র উদয়ে তিনি অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েন । তখন তাঁর হৃদয়ে এই দৈন্যবেগ উচ্ছলিত হয়ে ঐ কর্তৃত্বাভিমানটিকে অপসারিত করে দেয় । ইহাই প্রকৃত ভক্তের দৈন্যের স্বরূপ । এটি ভক্তের মূল্যবান্ সাধন-সম্পদ্ । এমনকি শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ লিখেছেন — প্রেম এবং দৈন্য বড় ভিন্ন বস্তু নয়, উভয়ই উভয়ের কার্য ও কারণ।

ভক্ত সাধকের নাম-সাধনদশায় এই দৈন্যই বৈষ্ণব-নিন্দাদি ভক্তির বিঘাতক বা প্রতিকূল অপরাধকে অপসারিত করে সাধকের প্রতি নামের প্রসন্নতা আকর্ষণ করে । যেমন আমাদের চক্ষু অতি কোমল ইন্দ্রিয়, অথচ সব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ । সামান্য কিছু প্রতিকূল অবস্থাতেই চক্ষুর ক্ষতি হতে পারে বলে শ্রীভগবান্ চক্ষের পলক সৃষ্টি করেছেন, পলক সবসময় চক্ষুকে রক্ষা করছে । দৈবাৎ যদি ধূলিকণা প্রভৃতি চক্ষে প্রবিষ্ট হয়, তখন চক্ষের ভিতর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী রয়েছে তা'

Scanned with CamScanner

জল ছেড়ে চক্ষুকে প্লাবিত করে ধূলিকণাকে বহিষ্কৃত করে চক্ষুকে পরিষ্কার রাখে। তদ্রূপ সাধকের দৈন্য ভক্তির বিঘাতক নামাপরাধাদিকে বহিষ্কার করে সাধকের চিত্তকে নিরপরাধ রাখে। এই 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটি পাঠ করে মহাপ্রভু বিশ্বের নাম-সাধকগণকে চরম দৈন্য-সাধনার ইঙ্গিত করলেন। দৈন্যই নাম-সাধকের নামসাধনার জীবাতু। দৈন্যহীন নাম-ভজন যেন নিষ্প্রাণ। অতএব মহাপ্রভুর এই মহাবাণীর সঙ্গে নামসাধকগণকে বিশেষভাবেই পরিচিত হতে হবে।

প্রভু বল্লেন — **'তৃণাদপি সুনীচেন'** তৃণ-অপেক্ষাও নামসাধককে সুনীচ হতে হবে। "তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সেও গবাদির খাদ্যরূপে আত্মনিয়োগ করে তাদের সেবা করছে। আবার তদ্দ্বারা গাভী দুগ্ধদান করলে তা' ভগবৎ-সেবায় লাগছে। গৃহাদির আচ্ছাদন, ভগবন্মন্দিরাদির আচ্ছাদন-কার্যেও তৃণ বিশেষ সেবা করছে। কিন্তু আমার দ্বারা কারো কোনরূপ সেবা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এসব কথা চিন্তা করে সাধক নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ মনে করবেন। অথবা তৃণের উপর কেহ পদার্পণ করলে তৃণ অবনমিত হয়, পা তুললেই কিঞ্চিৎ উন্নমিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সাধককে যদি কেউ পদদলিত করেন, তিনি কিঞ্চিৎ উঠারও চেষ্টা করবেন না।' অবশ্য এই দৈন্যভাবটি সাধকের অন্তরে অনুভূত হওয়া চাই। যে পর্যন্ত না সাধকের চিত্তে এই দীনভাবের অনুভূতি হয়, যে পর্যন্ত না তিনি মনেপ্রাণে নিজেকে তৃণাপেক্ষা অধম বা নীচ

Scanned with CamScanner

মনে করেন, সে পর্যন্ত কেবল বাক্যেই দৈন্যের আবৃত্তি করলে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবটি সিদ্ধ হবে না । মনের দৈন্যই প্রকৃত দৈন্য । মনে অভিমান, অহঙ্কার যথেষ্টই রয়েছে; আর বাক্যে কেবল দৈন্যের অভিনয় — ইহা কাপট্য-ব্যতীত আর কিছুই নয় । এরূপ কপট-দৈন্যে কারো হৃদয় শোধন হয় না ।

আবার **'তরোরিব সহিষ্ণুনা'** — সাধক বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হবেন । বৃক্ষকে কেউ ছেদন করলেও বৃক্ষ কিছু বলে না, নীরবে সব সহ্য করে । ছেদনকারী শত্রুর বিরোধিতা তো সে করেই না, বরং তৎকালেও তাকে ছায়া ও ফলাদি দিয়ে তার সেবাই করে থাকে । "ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ।" সহিষ্ণুতার এটি চরম দৃষ্টান্ত । শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবন্তীপুরবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের চরিত্রে এবং যবনগণ-কর্তৃক ঠাকুর হরিদাসকে বাইশ বাজারে প্রহারে এতাদৃশ সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয় । যবনগণ যখন বাইশ বাজারে ঠাকুর হরিদাসকে প্রাণান্তক প্রহার করছে, তখনো তিনি তাঁর ইষ্টের নিকট তাদের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনারত —

"এ সব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ ।
মোর দ্রোহে নহুঁ এ সভার অপরাধ ।।" (চৈঃ ভাঃ)

বৃক্ষ জল সিঞ্চনের অভাবে শুষ্ক হয়ে মরে গেলেও কারো কাছে জল চায় না । বরং সকলকে ফল, কাষ্ঠ, পত্র, নির্যাস প্রভৃতি দিয়ে সকলের সেবাই করে থাকে । গ্রীষ্মে সূর্যের তাপ, বর্ষার জলধারা, শীতের প্রকোপ বৃক্ষ সবই অকাতরে সহ্য করে

Scanned with CamScanner

থাকে। তদ্রূপ দৈন্যভাবাপন্ন নামসাধক চরম সহিষ্ণু হওয়ার অভ্যাস করবেন। অপরের দ্বারা নিগৃহীত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়েও তাদের সেবাই করবেন। কারো প্রতি রুষ্ট হবেন না। কারো কাছে কিছু প্রার্থনাও করবেন না। বরং শক্তি অনুরূপ ধনাদি দানে অন্যের সেবা করবেন। সকলের সর্বপ্রকার উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করবেন।

আবার **'অমানিনা মানদেন'** — নামসাধক নিজে কারো কাছে কোনরূপ সম্মান চাইবেন না। সর্বদা নিরভিমান থেকে বৈষ্ণব-ভক্তগণের তো কথাই নেই; সমস্ত জীবেই ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সকল প্রাণিকেই প্রতিনিয়ত সম্মান দান করবেন। এবিশ্বে তাঁর অবমাননার পাত্র কেউই থাকবে না।

"অন্তর্দ্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥"
(ভাঃ ৬।৪।১৩)

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন, সুতরাং প্রত্যেক জীবই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির তুল্য। অতএব ভক্তের সম্মানের যোগ্য। মন্দির ভগ্ন, বিকৃত, অসংস্কৃত, অপরিছন্ন হলেও যেমন ভক্তের নিকট সম্মানার্হ, তদ্রূপ লৌকিক-দৃষ্টিতে কোন প্রাণী নীচ, অবহেলিত হলেও সর্বদা ভক্তের নিকট নমস্য। তাই "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল-গোখরম্" (ভাঃ-১১।২৯।১৬)। অর্থাৎ 'সকলের মধ্যে অন্তর্যামি-রূপে

Scanned with CamScanner

ঈশ্বর আছেন জেনে চণ্ডাল, কুক্কুর, গো, গর্দভ পর্যন্ত সকল প্রাণিকেই দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবেন ।' "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য ধরি ।।" (চৈঃভাঃ) এরূপে দৈন্যভাবাপন্ন সাধক সর্বদা হরিকীর্তন করবেন । নিরপরাধে সর্বদা হরিকীর্তনে পূর্বপূর্ব জন্মের বা এ-জন্মেরও সঞ্চিত অপরাধাদি সব বিনষ্ট হবে এবং সাধক অচিরায় শ্রীনাম-প্রেমলাভে ধন্য বা কৃতার্থ হতে পারবেন — **'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।'**

কেউ কেউ বলে থাকেন — "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ । 'তৃণাদপি' শ্লোকেতেই পড়ি গেল বাধ ।।" 'তৃণের ন্যায় সুনীচ এবং বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হওয়া কি সাধারণ সাধকের পক্ষে সম্ভব ? অথচ মহাপ্রভু নামে প্রেমপ্রাপ্তির সাধনরূপে এই শ্লোকটিকেই উল্লেখ করলেন । যেহেতু সহজ সুখসাধ্য নামসাধনের মধ্যেও তো মহাপ্রভু একটি জটিল সমস্যাই এনে দিলেন ?'

সাধারণের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হতে পারে বটে, কিন্তু একটু সুচিন্তিতভাবে বিচার করলে বুঝা যাবে, ভক্তিমার্গে সাধকের যে সাধনরূপ পুরুষাকার, তা' একমাত্র কৃপাতেই সফলিত হয়ে থাকে । নামসাধক যদি নিরপরাধে নাম-গ্রহণের জন্য আর্তিভরে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে শ্রীনামের কৃপাতেই তার মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে। তৃণাদপি শ্লোক যাজনের সামর্থ্যও সাধক শ্রীনামের করুণাতেই অনায়াসে লাভ করবেন । তার সঙ্গে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের করুণার যোগ হলে তো কথাই নেই ।

Scanned with CamScanner

আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের শ্রীমুখে এবিষয়ে ব্রজেই সংঘটিত একটি সত্য ঘটনার কথা শুনেছিলাম। এখানে তা' উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। প্রাচীন-কালে বঙ্গদেশীয় এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কর্মজীবনের অবসর কালে ব্রজবাসের আকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবনে এসেছিলেন। তিনি কোন সদগুরুর নিকট দীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ করে ভজনের সংকল্প নিয়ে এক প্রসিদ্ধ ভজনানন্দী মহতের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সেই মহৎ তাঁর সহিত আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে প্রবল বিদ্যার অভিমান রয়েছে। তিনি ঐ মহতের নিকট প্রায়ই নিজের দীক্ষা-শিক্ষার নিমিত্ত নিবেদন করলেও ঐ কারণে সেই মহানুভব তাঁর কথায় যেন ততটা কর্ণপাত করতেন না। একদিন তিনি অধীরপ্রাণে দীক্ষা নেওয়ার জন্য মহতের নিকট কান্নাকাটি করলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন — সাতদিন তাঁকে সময় দেওয়া হচ্ছে, এই সাতদিনের মধ্যে তিনি তাঁর থেকে সববিষয়ে নিকৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা বস্তুকে সাথে নিয়ে এলেই তাঁর দীক্ষা হবে। তবে যাঁকে আনবেন, তিনি যেন সব বিষয়েই তাঁর থেকে নিকৃষ্ট বা তুচ্ছ হন।

প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি মনে ভাববেন এ আর কঠিন কাজ কি, জগতে প্রায় সবাই ত তাঁর থেকে নিকৃষ্ট। একজন কাকেও সঙ্গে নিয়ে এলেই তো হবে। কিন্তু সেই মহানুভব কেবল যে তাঁকে এই আদেশটিই করলেন তা' নয়, আদেশের সঙ্গে সঙ্গে একটু কৃপাও করলেন। সেই ব্যক্তি যেমনি চিন্তা করতে লাগলেন —

Scanned with CamScanner

সব দিক্ দিয়ে তাঁর থেকে ছোট বা নিকৃষ্ট কে, সেই মহৎ-কৃপায় তখন তাঁর নিজের দোষগুলো এবং অন্যের গুণগুলো চক্ষের সামনে ভাসতে লাগল। বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্রী এমনি যে, সর্বত্রই গুণ-দোষ মিশানো। তিনি চিন্তা করে মানব-জগতে তাঁর থেকে সব দিক্ দিয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি খুঁজে পেলেন না। তখন পশু-জগতে ও পক্ষি-জগতে মনে মনে তাঁর থেকে সব বিষয়ে নিকৃষ্ট অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যেও পেলেন না, কেননা তাদের ভিতর এমন সব শক্তি বা গুণ আছে, যা মানবের মধ্যে নেই। শেষে বৃক্ষলতার মধ্যে অনুসন্ধান করলেন, সেখানে তো পাবারই উপায় নেই, কারণ মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে বৃক্ষের মতই সহিষ্ণু হতে বলেছেন। এভাবে সর্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর ছ'দিন অতীত হয়ে গেল। আর একদিন মাত্র বাকী। তার পরদিনই সেই মহাত্মার নিকটে তাঁর থেকে সব বিষয়ে নিকৃষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নিতে হবে, নচেৎ দীক্ষা হবে না। সপ্তম দিবসে প্রাতে তিনি মাঠে শৌচক্রিয়ায় গমন করেছেন। মনটা খুবই অস্থির, কারণ সেদিনই তাঁর দীক্ষার দিন। পুরীষ ত্যাগ করতে করতে ব্যাকুল হয়ে ভাবছেন, এই মলই তাঁর থেকে সব বিষয়ে নিকৃষ্ট হবে। সুতরাং এই কথাই প্রভুর কাছে বলব। আজ সাতদিন তাঁর চিন্তা মহৎকৃপায় নিজের দোষ ও অন্যের গুণ দেখে এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, মলের পক্ষ হয়ে তার চিন্তা যেন তাকে বলছে — 'ভাই! তুমি যে পুরীষকে তোমার থেকে নিকৃষ্ট বলছ ভেবে দেখ, এ তোমার

Scanned with CamScanner

সংশ্রবে আসার পূর্বে দেবতার নৈবেদ্য ছিল। তোমার প্রাণরক্ষার বা দেহ-পুষ্টির নিমিত্ত নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এই ঘৃণ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। অতএব যে নিজের কল্যাণের জন্য ভাল বস্তুকে মন্দ করে দেয়, সে নিকৃষ্ট না হয়ে; ভালবস্তু হয়ে যে অন্যের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মন্দ হয়ে যায়, সে কি নিকৃষ্ট হতে পারে ?

একথা ভাবতেই তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন। মনে মনে বল্লেন, না না, এতো আমার থেকে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইত্যবসরে একটি পুরীষের কীট সেই দিকে আসছে, তখন তিনি ভাবছেন— এবার হয়ে গেছে, এই পুরীষের কীটটিই আমার থেকে সব বিষয়ে নিকৃষ্ট। তখনি তাঁর চিন্তা কীটের পক্ষ হয়ে বলছে — "ভাই তুমি দেবতার নৈবেদ্যকে পুরীষে পরিণত করেছ, আর পুনরায় একে পবিত্র করতে পারবে না, কিন্তু এ যদি এই মলের মধ্যে কিছু সময় বাস করে একে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়ে পবিত্র করে দেবে, এগুণ তোমাতে নেই। এ অংশে তুমি নিকৃষ্ট।"

এস্থানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বিশ্ব-বন্দনীয় মহাত্মা হয়েও শ্রীল নিতাই-চাঁদের কৃপার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন —

"জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥

Scanned with CamScanner

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে ?'' (চৈঃ চঃ)

এত বড় বিশ্ববন্দিত মহাত্মার কিভাবে এটি অনুভবের মধ্যে আসতে পারে যে তিনি পুরীষের কীটের থেকে ছোট ? আর যদি এ কেবল মুখের কথাই হয়, অন্তরের অনুভূত দৈন্য না হয়, তবে তো এটি কাপট্যেই পর্যবসিত হবে ? সুতরাং মহৎগণের বা মহৎ-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জনেরই এটি অনুভবের মধ্যে আসতে পারে, এটি অন্যের পক্ষে সম্ভব নয় ।

যাহোক, সে ব্যক্তি স্নানাদি সমাপন করে সেই মহাত্মার নিকট গমন করলেন । মহাত্মা প্রশ্ন করলেন — 'কৈ আপনার থেকে সববিষয়ে নিকৃষ্ট কি আনলেন ?' তখন তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বল্লেন — 'প্রভু ! আপনার কৃপায় আজ সাতদিন চিন্তা করে যা' দেখলাম, তাতে এজগতে যদি কোন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বা বস্তু থাকে — তা' আমি । আমার থেকে কোন নিকৃষ্ট প্রাণী বা বস্তু বিশ্বে নেই ।' তখন সেই মহাত্মা সহাস্যবদনে তাঁকে আলিঙ্গন করে বল্লেন — 'অভিমানাদি ত্যাগ করে আমি যাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আসতে বলেছিলাম, আপনি তো সেই দীনভাবাপন্ন নিজেকে সঙ্গে এনেছেন । সুতরাং আপনার দীক্ষার আর কোন বাধা নেই ।' মহৎকৃপা লাভ করে সেই ভাগ্যবান্ অচিরায় অনুরাগময় ভজন-জীবন লাভে ধন্য হলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এশ্লোকের চমৎকার ব্যাখ্যা শ্রীমুখে প্রকাশ করেছেন —

Scanned with CamScanner

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

হে জগদীশ ! আমি ধন বা জন অথবা সুন্দরীভার্যা কিংবা সালঙ্কারা কবিতা প্রভৃতি কিছুই কামনা করি না। ঈশ্বর তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। প্রভুর এই চতুর্থ শ্লোকটি পাঠ করবার হেতু উল্লেখ করে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বল্লেন —

"কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপনধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥" ৩॥ (চৈঃ চঃ)

Scanned with CamScanner

প্রেমের স্বভাব — যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সে-ই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ।।" (চৈঃ চঃ)

প্রভু যখন 'তৃণাদপি' দৈন্যের শ্লোকটি পাঠ করলেন, তখন তাঁর দৈন্যের সিন্ধুতে উচ্ছ্বাস এলো । কারণ তিনি প্রেমের সিন্ধু, সুতরাং দৈন্যেরও সিন্ধু । আমরা বলেছি দৈন্য এবং প্রেম ভিন্ন বস্তু নয় ।

"দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্নঃ পরিপাকেণ জন্যতে ।
তাসাং গোকুলনারীণামিব কৃষ্ণ-বিয়োগতঃ ।।"

অর্থাৎ "প্রেমের পরিপাক-দশাতেই দৈন্যের প্রকাশ হয়ে থাকে । গোকুল-রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে পরমদৈন্য প্রকটিত হয়েছিল, তা' প্রেমের পরিপাক-দশাতেই হয়েছিল ।" শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে দৈন্যের প্রকাশ হয়েছিল, তাই দৈন্যের চরমভূমি । সর্বোপরি ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি শ্রীরাধারাণীর দিব্যোন্মাদেই দৈন্যের চরম পরাকাষ্ঠা । নীলাচললীলায় শেষ দ্বাদশবর্ষ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদলীলাই ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদ্য । সেই সময়েই এই শিক্ষাষ্টকের প্রকাশ। সুতরাং প্রভুর সেই বিভু রাধাপ্রেমের মহাদৈন্যসিন্ধুতে যে কত শত ভাবের তরঙ্গ জাগে তার সীমা নেই । দৈন্যতরঙ্গের উচ্ছলনে চিত্তটি যখন উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তখন শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন শুদ্ধভক্তি । প্রশ্ন হবে, যিনি প্রেমের সিন্ধু, তিনি আবার সাধারণ সাধকের মত শুদ্ধভক্তি চান কেন ? তদুত্তরে বলা হচ্ছে— "প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ । সে-ই মানে

Scanned with CamScanner

কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ।।" অতৃপ্তিই ভক্তির স্বভাব । পিপাসাই ভজন-রসাস্বাদনের পরিমাপক । প্রেম সতত প্রেমিকের হৃদয়কে নিবিড় প্রেম-পিপাসায় ব্যাকুল করে রাখে । যত পিপাসা, তত আস্বাদন, যত আস্বাদন তত পিপাসা । এজগতে ক্ষুধা এবং খাদ্যবস্তু উভয়েই উভয়কে বিনাশ করে, কিন্তু প্রেমের রাজ্য ঠিক এর বিপরীত । সেখানে কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন প্রেমপিপাসাকে বাড়ায় এবং প্রেম মাধুর্যাস্বাদনকে বাড়িয়ে তোলে।

"ক্ষুধা আর খাদ্যবস্তু উভয়ে যেমন ।
উভয়ে উভয়ের হয় বিনাশ-কারণ ।।
প্রেমরাজ্যে এই রীতি অতি বিলক্ষণ ।
উভয়ে উভয়ের হয় বর্দ্ধন-কারণ ।।"

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রথম খণ্ডের শেষে শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর চেয়েছিলেন —

"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্তু কদাপি ন ।
ভবতোঽনুগ্রহে ভক্তৌ প্রেম্ণি চানন্দভাজনে ।।"
(বৃঃ ভাঃ-১ ।৭ ।১৩৫)

"হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! আনন্দ-স্বরূপ আপনার অনুগ্রহে ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখনো কাহারো তৃপ্তি না হয়, এটি আমার প্রার্থিত বর ।" তচ্ছ্রবনে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন —

"বিদগ্ধনিকরাচার্য্য কো নামায়ং বরো মতঃ ।
স্বভাবো মৎকৃপাভক্তিপ্রেম্ণাং ব্যক্তোঽয়মেব যৎ ।।"
(ঐ-১ ।৭ ।১৩৬)

Scanned with CamScanner

"হে বিদগ্ধচূড়ামণি শ্রীনারদ ! আপনি একি বর প্রার্থনা করলেন ? আমার কৃপার, ভক্তির ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাব (অতৃপ্তি-স্বভাব) তো সকলেই অবগত আছেন ।" ভক্ত যতই প্রেমের দিকে এগিয়ে যান, ততই প্রেমপিপাসায় হাহাকার করেন । মহাপ্রভু প্রেমের সিন্ধু হয়েও স্বরূপ দামোদর রামানন্দ-রায়ের প্রতি বল্লেন — 'শুন মোর প্রাণের বান্ধব । নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ।' (চৈঃ চঃ)। কেউ যদি বলেন — প্রভু ! আপনি প্রেমের অবতার, নিশিদিন আপনার শ্রীঅঙ্গে এত অশ্রু-পুলকাদি প্রেমের বিকার দেখা যাচ্ছে । আপনি যদি বলেন আপনার প্রেম নেই, একথা বিশ্বাস করবে কে ?' তদুত্তরে বল্লেন — 'তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ।' (ঐ)। অর্থাৎ 'আমি যে রোদন করছি, তা' আমার ভক্তির নিমিত্ত নয়, আমার যে ভক্তি আছে, আমি যে সৌভাগ্যবান্, একথা খ্যাপনের জন্যই আমি রোদন করে থাকি ।' ভক্তির এমনি বিচিত্র তৃষ্ণাময় স্বভাব ! তাই প্রেমের সিন্ধুতে দৈন্যের আলোড়ন ! প্রবল দৈন্য-ভরে সাধারণ অজাতরতি সাধকের ন্যায় শ্রীভগবানের নিকট প্রভু প্রার্থনা করছেন — "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।" 'হে জগদীশ ! আমি ধন, জন, সুন্দরীভার্যা, কবিতা (কবিত্বশক্তি) কিছুই চাই না ।'

মায়ামুগ্ধ জীবকুল শ্রীগোবিন্দচরণ বিস্মৃত হয়ে অনাদি কাল থেকে ধন-জনাদির লিপ্সা বুকে নিয়ে কর্মময় সংসারে

Scanned with CamScanner

নানাযোনীতে পরিভ্রমণ করে বেড়ায় । দুর্লভ মানবদেহ লাভ করে মহৎকৃপায় শ্রীভগবানের উপাসনা-পথ অবলম্বন করেও কেউ কেউ পূর্ব সংস্কার-বশতঃ শ্রীভগবানের নিকট ধন, জনাদি কামনা করে থাকেন । এসব ইতর-বাসনা মনে থাকলে সাধন-ভজন করলেও প্রেমলাভ সুদূর পরাহতই হয়ে থাকে ।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ।।" (চৈঃ চঃ)

শ্রুতি বলেন — "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেন অমুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব হি নৈষ্কর্ম্ম্যম্" (গোপাল-তাপনী)। অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি । ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ববিধ কামনারহিত হয়ে নিরন্তর শ্রীহরি-স্মৃতিময় পরমাবেশই ভজন এবং একেই যথার্থ নৈষ্কর্ম্য বলা হয় ।' এস্থলে ভজন ও নৈষ্কর্ম্যের সমানাধিকরণ্য-দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে যে, শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হলেই ভক্তের সর্ববিধ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়, সুতরাং তাঁদের অন্তরে আর শ্রীভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষা-ব্যতীত ইতর-বাসনা থাকতে পারে না । তখন গুণবৃত্তিশূন্য মন কেবল শ্রীভগবানের সেবারসাস্বাদনেই বিভোর থাকে । শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে তাই ভক্তির লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্ ।
হৃষিকেন হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ।।"

"সর্বপ্রকার উপাধি অর্থাৎ ভগবৎ সেবাবাসনা-ব্যতীত অন্যবাসনাশূন্য এবং সেবাপরতায় নির্মল — ইন্দ্রিয়সমূহের

Scanned with CamScanner

নানাযোনীতে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। দুর্লভ মানবদেহ লাভ করে মহৎকৃপায় শ্রীভগবানের উপাসনা-পথ অবলম্বন করেও কেউ কেউ পূর্ব সংস্কার-বশতঃ শ্রীভগবানের নিকট ধন, জনাদি কামনা করে থাকেন। এসব ইতর-বাসনা মনে থাকলে সাধন-ভজন করলেও প্রেমলাভ সুদূর পরাহতই হয়ে থাকে।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রুতি বলেন — "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেন অমুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব হি নৈষ্কর্ম্ম্যম্" (গোপাল-তাপনী)। অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ববিধ কামনারহিত হয়ে নিরন্তর শ্রীহরি-স্মৃতিময় পরমাবেশই ভজন এবং একেই যথার্থ নৈষ্কর্ম্য বলা হয়।' এস্থলে ভজন ও নৈষ্কর্ম্যের সমানাধিকরণ্য-দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে যে, শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হলেই ভক্তের সর্ববিধ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়, সুতরাং তাঁদের অন্তরে আর শ্রীভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষা-ব্যতীত ইতর-বাসনা থাকতে পারে না। তখন গুণবৃত্তিশূন্য মন কেবল শ্রীভগবানের সেবারসাস্বাদনেই বিভোর থাকে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে তাই ভক্তির লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষিকেন হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

"সর্বপ্রকার উপাধি অর্থাৎ ভগবৎ সেবাবাসনা-ব্যতীত অন্যবাসনাশূন্য এবং সেবাপরতায় নির্মল — ইন্দ্রিয়সমূহের

Scanned with CamScanner

দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই 'ভক্তি' বলা হয় ।" এসব শ্রুতি-স্মৃতির উক্তি বিচার করে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ভক্তির অনবদ্য বৈশিষ্ট্য এবং শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত শুদ্ধভক্তির পূর্ণলক্ষণটি নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন ।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ।।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১১)

"অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত, অথচ আনুকূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমাভক্তি বলা হয় ।" শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত (এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে অন্যান্য ভগবদবতারও বাচ্য) বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তি, এটি ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ বা মুখ্য বিশেষণ । অনুশীলন পদটি 'শীল্' ধাতুর থেকে নিষ্পন্ন । 'শীল্' ধাতুর অর্থ শীলন । এই শীলনও দ্বিবিধ — প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক । প্রথমটি কায়িক-বাচিক-চেষ্টারূপা এবং প্রীতি বিষয়াত্মক মানসভাব । অর্থাৎ দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যাদি, বাক্যদ্বারা তাঁর নাম-গুণ-লীলাদি কীর্তন, মনদ্বারা তাঁর নাম গুণ-লীলাদি চিন্তন এবং অন্তঃকরণে সর্বদা প্রীতি-সম্পাদন । আর নিবৃত্তিমূলক বলতে নামাপরাধ ও সেবাপরাধাদি বর্জনাত্মক চেষ্টা ।

এই অনুশীলনের ভক্তিমাত্র সিদ্ধির নিমিত্ত 'আনুকূল্য' এই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে । কেননা আনুকূল্য ভাব-ব্যতীত কৃষ্ণানুশীলনেও ভক্তি হয় না । প্রতিকূল ভাবেও শ্রীকৃষ্ণানুশীলন

Scanned with CamScanner

হতে পারে, যেমন কংস, শিশুপালাদির হয়েছিল; কিন্তু প্রাতিকূল্যভাব থাকায় তাতে ভক্তিত্ব সিদ্ধি হয় নি ।

আবার আনুকূল্য বলতে যদি শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তিকেই গ্রহণ করা যায়, তবে ভক্তিলক্ষণে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আসতে পারে । যেমন অসুরগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্ত্র-প্রহারাদি অমিত বলশালী শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধরসাস্বাদনরূপ রুচিকর হলেও অসুরদের প্রতিকূল বা দ্বেষভাব থাকায় তাতে ভক্তিরস হয় না । পক্ষান্তরে মা যশোদা ক্ষুধাতুর কৃষ্ণকে ত্যাগ করে যখন দুগ্ধরক্ষার জন্য গমন করলেন, মায়ের সে কার্য কৃষ্ণের রুচিকর হয় নি; বরং তৎকালে তাঁর ক্রোধেরই উদ্রেক হয়েছিল। তবু মা যশোদার প্রাতিকূল্যভাব না থাকায় তাতেই ভক্তিরসের পোষণ হল । অতএব এখানে 'আনুকূল্য' অর্থে প্রাতিকূল্য শূন্যতাই বোদ্ধব্য ।

এভক্তি সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দ্বিবিধ । উপাধিযুক্ত ভক্তির নাম সোপাধিক এবং উপাধিশূন্য ভক্তির নাম নিরুপাধিক । ভক্তির উপাধি মুখ্যত দু'টি — একটি অন্যাভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ । অন্যাভিলাষ বলতে ভোগবাসনা, মুক্তিবাসনা প্রভৃতি এবং অন্যমিশ্রণ বলতে জ্ঞান, কর্মাদির আবরণ । অতএব পূর্বোক্ত অনুশীলনটি যদি অন্যাভিলাষ শূন্য ও অন্যমিশ্রণ রহিত হয়ে কেবল শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলাদির শ্রবণ, কীর্তনাদি আবেশময়ী হয়, তবেই তাকে শুদ্ধভক্তি বলা হবে । এরই নামান্তর উত্তমা, নির্গুণা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা,

Scanned with CamScanner

অকিঞ্চনা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি । তাই শুদ্ধভক্তেরা শ্রীভগ-বানের সেবা-ব্যতীত বা ভক্তি-ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন না । শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলেছিলেন —

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষু স্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥
ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥"

'হে প্রভো । হে জগদ্‌গুরো ! কামনাসঙ্গে আমি অতি ভীত, আমি কামনা-ত্যাগ নিমিত্ত তোমার আশ্রয় নিয়েছি । আমার চিত্ত স্বভাবতঃই কামনা-মলিন, অতএব অন্য বরে আমায় প্রলুব্ধ করবেন না । আপনি কি ভৃত্যলক্ষণ জিজ্ঞাসু হয়ে সংসারের বীজস্বরূপ হৃদয়গ্রন্থির ন্যায় ভববন্ধকর অভিলাষ-সমূহে আমায় প্রেরণা দিচ্ছেন ? নচেৎ করুণাময় আপনি ভক্তের অনর্থ-সাধনে কি আপনার প্রবৃত্তি সম্ভব ? আপনার সেবা করে যাঁরা আপনার নিকট পার্থিব ভোগ্যপদার্থ কিছু কামনা করেন, তাঁরা সেবক নন, তারা তো বণিক্ ।"

প্রহ্লাদ মহাশয়ের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, করুণাময় শ্রীভগবান্ ভৃত্যকে ভববন্ধকর হৃদয়গ্রন্থির সৃষ্টিকারী ধন, জনাদির লোভ কখনই দেখাতে পারেন না । সুতরাং তিনি

Scanned with CamScanner

ভক্তকে যে ধন, জনাদির বর নিতে বলেন — এ কেবল সকাম ভক্তগণকে প্রকৃত ভৃত্যের লক্ষণটি জানিয়ে দেওয়ার জন্যই। অর্থাৎ ভগবান্ বর দিতে চাইলেও শুদ্ধভক্ত যখন তাঁর সেবা-ব্যতীত অন্য বর চান না, তখন বিশ্বের সকাম মানবগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, ভগবানের নিকট তাঁর সেবা-ব্যতীত অন্য কিছু চাইতে নেই। কারণ যাঁরা ভগবানের ভজন করে তাঁর সেবা-ব্যতীত পার্থিব ধন-জনাদি তাঁর কাছে চান তাঁরা ভৃত্য নন, তারা তো বণিক্ বা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী ব্যক্তি যেমন সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে বহু আয়ের জন্য প্রযত্ন করেন, তদ্রূপ সকাম ব্যক্তি সামান্য পুষ্প, নৈবেদ্যাদি ভগবানকে সমর্পণ করে তাঁর কাছে বহু অর্থ-সম্পদাদি প্রার্থনা করে নেন। শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ?"

(ভঃ রঃ সিঃ-১।২।২২)

অর্থাৎ "ভোগ-বাসনা ও মুক্তি-বাসনারূপ পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়ে অবস্থান করে, ততক্ষণ ভক্তিসুখের উদয়ই সম্ভবপর হয় না।" পিশাচী বা ভূত লাগলে যেমন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যা' আহারাদি করে তা' সব সেই ভূতই ভোগ করে সুতরাং আহারাদি করেও ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হতে থাকে; তদ্রূপ যাঁদের অন্তরে ভোগবাসনা, মুক্তিবাসনাদি বিরাজ করে, তাঁরা ভজন করলেও সেই ভজনে ভুক্তি-মুক্তির কামনাই পরিপুষ্ট হয়,

Scanned with CamScanner

ভজনবিগ্রহ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে থাকে । তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ ভজনকারী সকাম ভক্তের হৃদয়ে স্বীয় নাম, রূপ, লীলাদির মাধুর্যাস্বাদন দান করে তাঁদের হৃদয় থেকে ঐ কামনা-পিশাচীকে বিতাড়িত করত স্বয়ং তাঁদের চিত্তকে নির্মল করে থাকেন ।

"কৃষ্ণ কহে — আমায় ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন — "স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্" (ভাঃ-৫।১৯।২৬)। অর্থাৎ "যাঁরা শ্রীভগবানের ভজন করেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না, কেবল ধন-জনাদি কামনা করেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁদের অন্য কামনার আচ্ছাদক স্বীয় পাদ-পল্লব তাঁদের দান করে থাকেন ।" উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামী-পাদ লিখেছেন — "স তু পরমকারুণিকঃ তৎপাদপল্লবমাধুর্য্যা-জ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতামিচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লবমেব বিধত্তে — তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ । যথা মাতা চর্ব্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি, তদ্বদিতি ভাবঃ ।" অর্থাৎ 'ভগবৎ পাদপদ্মের মাধুর্যের কথা যাঁরা জানেন না, ব'লেই সেই শ্রীচরণ-প্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁদের নেই, তাঁরা যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, পরম কারুণিক শ্রীভগবান

Scanned with CamScanner

তাঁদিগেও সর্বকাম-পরিপূরক স্বীয় পাদ-পল্লব দিয়ে থাকেন। যেমন যে বালক মাটি খাচ্ছে, মাতা তার অনিষ্টকর মাটিটি ফেলে দিয়ে তাঁর মুখে পরম সুস্বাদু মিষ্টান্ন দিয়ে থাকেন তদ্রূপ।' এভাবে ভগবৎকৃপায় ধন, জনাদির কামনা সকাম-ভক্তের অন্তর থেকে দূরীভূত হয় এবং তিনি শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তিলাভে ধন্য হয়ে থাকেন।

আবার প্রায়শ মহৎকৃপাতেই সকামভক্তের ধন-জনাদির বাসনা অন্তর থেকে দূরীভূত হয় এবং তাঁরা শুদ্ধভক্তিলাভে ধন্য হন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব সকামা ভক্তিকে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন। সাত্ত্বিক ভক্তিকে কৈবল্যকামা বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে ভগবানের চিৎশক্তি হ্লাদিনী এবং সম্বিতের সারবৃত্তি ভক্তি, সুতরাং চিদানন্দরূপিণী বা নির্গুণা। প্রাকৃত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসগুণের সঙ্গে ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই। সকাম ভজন-কারীর অন্তরের প্রাকৃতগুণের উপচার করেই শ্রীকপিলদেব ভক্তিকে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক বলেছেন। তামস-ভক্তির লক্ষণ —

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥"
(ভাঃ-৩।২৯।৮)

শ্রীকপিলদেব বল্লেন — "হে মাতঃ! যে জন হিংসা, গর্ব, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সঙ্কল্প করে কোপনস্বভাব এবং ভেদদৃষ্টিতে

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ নিজের সুখ-দুঃখ যেমন প্রিয় ও অপ্রিয় তেমনি যে অন্যেরও — এরূপ দৃষ্টিশূন্য বা সর্বভূতে দয়াশূন্য হয়ে যে আমার ভজন করে সে তামসভক্ত ।" এরূপ তামসভক্তও শুদ্ধভক্তের সঙ্গ বা কৃপার ফলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

কথিত আছে — দাক্ষিণাত্যের কোনো রাজা একদা শ্রীরঙ্গ -নাথজীউকে একশত আটটি সোনার কমল উপহার দিয়েছিলেন। মণি-মুক্তাঘটিত সোনার কমলগুলো ঠাকুরের শ্রীচরণতলে থরে থরে সাজানো ছিল । পরে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রচুর তুলসীপত্র দিয়ে ঠাকুরের সেবা করেন । তাতে, দু'চারটি সোনার কমল তুলসী-পত্রে আবৃত হয়ে যায় । রাজা টের পেয়ে ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করলে শুদ্ধভক্তিমান্ সেই বিপ্র সোনার কমল বা মণিমুক্তা-অপেক্ষা তুলসী যে ঠাকুরের সমধিক প্রিয়, তা' ব্যাখ্যা করে রাজাকে শোনালেন । তাতে মাৎসর্য-পরায়ণ তামসভক্ত সেই রাজা ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন — তুলসী দিয়ে পুজো করে ব্রাহ্মণ পূর্বে ভগবানের দর্শন পান না রাজা আগে ভগবানের দর্শন পাবেন তা' দেখা যাবে । অতঃপর সেই রাজা গৃহে এসে বিষ্ণুর দর্শন-কামনায় বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে একটি মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন । যজ্ঞ করতে করতেই রাজা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন । মাৎসর্য-পরায়ণ রাজা তখন মাৎসর্যের জ্বালায় ক্ষোভে দুঃখে অধীর হয়ে ঐ যজ্ঞানলে প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন । যজ্ঞকুণ্ড পরিক্রমা করে মহারাজ যেমনি যজ্ঞানলে ঝাঁপ দেবেন, তেমনি যজ্ঞকুণ্ড

Scanned with CamScanner

থেকে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ উত্থিত হয়ে বল্লেন — "রাজন্ ! তুমি যদি শত শতবার এভাবে প্রাণবিসর্জন দাও, তবু তোমার নিকট আসার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না । কিন্তু আমার সেই পরম প্রিয়ভক্ত ব্রাহ্মণকে যখন আমি দর্শনদান করি তখন তিনি আমায় তোমাকে কৃপা করার জন্য বা দর্শন দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন । তাঁর প্রার্থনায় তোমার নিকট এসেছি । যেহেতু মাৎসর্যাদি ত্যাগ করে শুদ্ধভাবে ভজন কর, প্রেমলাভ করে আমার সেবা পেয়ে ধন্য হতে পারবে । রজ তম ভাব অন্তরে রেখে কখনই আমায় পাওয়া যায় না ।" একথা বলে ভগবান্ অন্তর্হিত হলে শুদ্ধভক্ত সেই বিপ্রের নিজের প্রতি করুণার কথা শুনে রাজা তাঁর কৃপায় মাৎসর্য ত্যাগপূর্বক শুদ্ধভক্তি লাভ করে ভগবদ্ভজন-সম্পদ লাভে ধন্য হলেন ।

এরূপ রাজস-ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে —

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা ।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ।।"
(ভাঃ-৩।২৯।৯)

অর্থাৎ "যে জন বিষয়, যশ অথবা ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির সংকল্প করে প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চন করে সেজন রাজস; কারণ তার আমা-ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিত্তের আবেশ রয়েছে, আমাতে চিত্তের আবেশ নেই, এটিই রাজস ভাবের হেতু ।" এই রাজস ভক্তও শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা-প্রভাবে তত্তৎবাসনা ত্যাগ করে শুদ্ধভক্তি-লাভে ধন্য হয়ে থাকেন । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ

Scanned with CamScanner

শ্রীধ্রুবের কথা বলা যেতে পারে। বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে ধ্রুব মহাশয় মাতার উপদেশে উৎকৃষ্ট রাজ্যাসন লাভের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠায় শ্রীভগবানকে ডাকতে থাকেন। শ্রীনারদের দর্শন ও কৃপাপ্রভাবে তাঁর চিত্ত হতে রাজ্যলাভের আকাঙক্ষা বিদূরিত হয়ে শ্রীভগবানের শুদ্ধভজনে চিত্ত নিবিষ্ট হল। পরে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করলে ধ্রুব মহাশয় স্তব করলেন —

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো-
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥"

(ভাঃ-৪।৯।১০-১১)

"হে নাথ! তোমার শ্রীপাদপদ্ম-ধ্যানে এবং তোমার ভক্তজনের কথা শ্রবণে প্রাণিগণের যে আনন্দ লাভ হয়, তোমারই স্বকীয় মহিমা-স্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও তা' হয় না, আর কাল-কবলিত স্বর্গাদি ভোগে যে সে আনন্দ নেই, তা' আর কি বলব।

Scanned with CamScanner

"হে অনন্ত ! যেসব নির্মলচেতা মহাপুরুষগণ তোমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিপরায়ণ, আমার যেন তাঁদের সঙ্গলাভ হয় । সেই সাধুগণের সঙ্গে তোমার গুণকথারূপ অমৃতপানে মত্ত হয়ে এই বহুবিপদ্‌সঙ্কুল ভয়াবহ সংসারসিন্ধু আমি অনায়াসে পার হতে পারব ।" এতদ্বারা ধ্রুবমহাশয়ের শুদ্ধা বা নির্গুণাভক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় ।

সাত্ত্বিক ভক্তির লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —

"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ ।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ।।"
(ভাঃ-৩।২৯।১০)

অর্থাৎ "যেজন কর্মপরিহার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে পরমেশ্বরে কর্মার্পণ করেন, রাজস-ভক্তের ন্যায় তিনিও পৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ ভক্তি-অপেক্ষা মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন, এজন্য সেই মোক্ষার্থী ভক্ত সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হন।"

মোক্ষকামী ভক্তগণও মহৎ-কৃপায় মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ করে শুদ্ধভক্তি লাভে ধন্য হয়ে থাকেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে —

"মুমুক্ষু — জগতে অনেক সাংসারিক জন ।
মুক্তি-লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ।।
সেই সভে সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায় ।
কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায় ।।

Scanned with CamScanner

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ।।"

তারপরই শ্রীকপিলদেব শুদ্ধা বা নির্গুণাভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করলেন —

"মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।।
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।।"

(ভাঃ-৩।২৯।১১-১৩)

"আমার গুণশ্রবণমাত্রেই সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্বগুহাশয় আমার প্রতি গুণ-শ্রবণকারীর যাতে অবিচ্ছিন্না মনোগতি হয়ে থাকে, পুরুষোত্তমবিষয়ে সেই অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যেভক্তি, তাই নির্গুণাভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হয়েছে । যাতে জনগণ আমা-কর্তৃক প্রদত্ত হলেও আমার সেবা-ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্যাদি মুক্তি পর্যন্ত গ্রহণ করেন না । তাদৃশ ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিকট তাঁর সেবা বা শুদ্ধভক্তিই কামনা করে থাকেন । তাই মহাপ্রভু বল্লেন — "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" 'হে জগদীশ ! আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, ঈশ্বর তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ।'

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন হতে পারে — শুদ্ধভক্তের কি বারবার জন্ম-মরণাদি ক্লেশভোগ করতে হয় ? তবে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলেছেন —

"প্রভু কহে — বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয় ।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥"

দেহ অপ্রাকৃত হওয়া মানেই জন্ম-মরণাদির আরম্ভক প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধাদি কর্মের ক্ষয় হওয়া । নচেৎ অপ্রাকৃত চিদানন্দময়দেহ লাভ করেও ভক্তের প্রারব্ধ কর্মফলানুসারে জন্ম, মরণাদি হবে, এবাক্য "অয়ং বন্ধ্যাপুত্র" কথার ন্যায় ব্যাঘাত দোষদুষ্ট হয় । সুতরাং ভক্তের জন্ম-মরণাদি হলেও তা' ভগবদিচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে, কর্মের ফলে নয় — এটিই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত । প্রেমসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত দেহ-পতনের পর দেহ-গ্রহণ করতে হবে, কারণ দেহ-ব্যতীত ভজন হয় না । আবার জাতরতি বা প্রাপ্তপ্রেম ভক্তকেও ভজন-রসমাধুরী আস্বাদন করবার নিমিত্ত ভগবান্ হয়ত দু'একটি জন্ম দিয়ে থাকেন । সুতরাং কর্মবাধ্য জীব যেরূপ দেহ-ধারণ ও ত্যাগাদিতে অসহনীয় দুঃখ-ভোগ করে থাকে, ভক্তের জন্ম-মরণাদি তদ্রূপ দুঃখপূর্ণ নয়, কিন্তু অনায়াসলব্ধ । পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে —

Scanned with CamScanner

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ।" অর্থাৎ 'কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম বৈষ্ণবের হয় না ।' রহস্য এই যে, শ্রীভগবান্ এবং ভক্তি ভক্তকে এবিষয়টি জানতে দেন না, কারণ এতে তাঁদের দৈন্যের হানি হতে পারে । দৈন্যের হানি হলে ভক্তের ভজনের ক্ষতি অনিবার্য । তাই ভক্ত-মহানুভবও মনে করেন যে, তাঁর কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম-মরণাদি অনিবার্য । তাই প্রার্থনা করেন — "নাথ ! জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ভবাম্যহম্ । তেষু তেষ্বচ্যুতা-ভক্তিরচ্যুতাস্তি সদা ত্বয়ি ।।" (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রহ্লাদের প্রার্থনা) । 'হে প্রভো ! কর্মফলানুসারে সহস্র সহস্র যোনীতে তো আমায় ভ্রমণ করতেই হবে; কিন্তু যখন যে যোনীতে জন্মাই না কেন, হে অচ্যুত ! সর্বদা তোমার চরণে যেন আমার অবিচ্যুত ভক্তি থাকে । শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের অনুরূপ প্রার্থনা দেখা যায় —

"কিয়ে মানুষ পশু, পাখী হয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট-পতঙ্গ ।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ ।।"

(পদকল্পতরু)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন — 'হে ভগবন্ ! তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ।' শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি পরমধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন —

Scanned with CamScanner

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।।" (ভাঃ-১।২।৬)

অর্থাৎ "যে ধর্ম-আচরণে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয়, সেই অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিকেই পরম ধর্ম বলা হয় । যদ্দ্বারা জীবের আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে থাকে ।" এশ্লোকের "অহৈতুকী" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখেছেন — "হেতুঃ ফলাভিসন্ধানং তদ্রহিতা" অর্থাৎ অহৈতুকী অর্থে ফলানুসন্ধানরহিত । শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সেবাব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিকের নিখিল কামনা বিবর্জিত । শ্রীজীব বলেন — "তস্যাঃ ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ — অতএব সুখ-রূপত্বাদহৈতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা" অর্থাৎ 'অহৈতুকী' বিশেষণটি শুদ্ধভক্তির স্বরূপভূতগুণ-বিশেষ । ভক্তি স্বতঃই সুখ-স্বরূপ বলেই "অহৈতুকী" হরিতোষণ-ব্যতীত অপর ফলানু-সন্ধানরহিত ।'

অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি মিলিত সম্বিৎশক্তির সারাংশই ভক্তি । এখানে 'সার' বলতে ভগবদানুকূল্যাভিলাষ বিশেষ । শ্রীভগবানের আনুকূল্য বা সেবাবাসনা-ব্যতীত অপর কোন অভিলাষ ভক্তের অন্তরে থাকে না । শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বা ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির তৃষ্ণার সহিত যদি কোন অন্য তৃষ্ণা-যোগের সম্ভাবনা থাকে স্থূণানিখনন-ন্যায়ে শুদ্ধভক্ত তা' বর্জন করে কেবল সেবামাত্রই কামনা করে থাকেন । শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধভক্ত শ্রীবৃত্রাসুরের স্তবে এর একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় —

Scanned with CamScanner

"অহং হরে তব পাদৈকমূল,-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেৰ্গুণানাং,
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং,
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা,
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ,
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা,
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥"
(ভাঃ-৬।১১।২৪-২৬)

শ্রীবৃত্রাসুর বল্লেন — "হে হরে ! আপনার শ্রীচরণ-যুগল যাঁদের একমাত্র আশ্রয়, আমি আপনার সেই দাসগণের অনুদাস হই এবং পরেও হব । আমার মন প্রাণনাথ আপনার গুণ স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণ-কীর্তন করুক, দেহ আপনারই সেবাদি কার্য করুক ।

হে নিখিলসৌভাগ্যনিধে ! আপনাকে পরিত্যাগ করে ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, বিশ্বের কর্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ — কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নেই ।

হে কমলনয়ন ! অজাতপক্ষ পক্ষি-শাবকগণ যেমন মাতার, ক্ষুধার্ত গো-বৎস যেমন মাতৃস্তন্যের, বিষণ্ণা প্রিয়া

Scanned with CamScanner

যেমন বিদেশগত প্রিয়ের দর্শন অভিলাষ করে, আমার মনও তেমনি আপনাকে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত ।" এই "অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ যা' লিখেছেন, তার মর্মার্থ এরূপ যে, অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ বলায় যে পক্ষিশাবকগণের পাখা গজায় নি, মা-ব্যতীত তাদের অন্য কোন আশ্রয়ও নেই এবং মা'র সাথে যাবারও তাদের সামর্থ্য নেই; একথা যেমন এতে ব্যঞ্জিত হয়েছে; তদ্রূপ অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক-জননীর উল্লেখ থাকায় অন্যজনে স্বভাবতঃ যে দয়া থাকা অসম্ভব, সেই দয়ার স্থিতি বা আধিক্য ব্যঞ্জিত হয়েছে । পক্ষি-শাবকগণের একমাত্র নির্ভরতা এবং অক্ষমতা ও তাদের মাতার অসাধারণ দয়ার আধিক্যহেতু মাতার প্রতি তাদের নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে । তদ্রূপ বৃত্রাসুরের একান্ত অক্ষমতা, নির্ভরতা ও শ্রীভগবানে নিরতিশয় প্রীতি এবং তাঁর প্রতি শ্রীভগবানেরও অসাধারণ করুণা ব্যঞ্জিত হয়েছে । আবার অজাতপক্ষ-পক্ষিশাবকগণের ব্যাকুলতাময় মাতৃদর্শনেচ্ছার ন্যায় বৃত্রাসুরের চিত্তও যে ভগবানের দর্শনোৎ-কণ্ঠায় নিরতিশয় ব্যাকুল বা অধীর — তা' বলা হয়েছে । কিন্তু পক্ষিশাবকগণের মাতা তাদের জন্য যে আহার্য নিয়ে আসে, সেই বস্তুই তাদের উপজীব্য ও আস্বাদ্য । সুতরাং তাদের দর্শনেচ্ছা কেবল মাতৃনিষ্ঠা নয় । কারণ তারা যে মাকে দেখতেই অভিলাষী তা' নয়, খাদ্যবস্তু লাভেরও অভিলাষ আছে । এই অংশে এই দৃষ্টান্তে সন্তোষ লাভ করতে না পেরে শ্রীবৃত্রাসুর "স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ" "ক্ষুধার্ত গো-বৎস যেমন

Scanned with CamScanner

স্তন্যের'' একথা বলেছেন । এখানে স্তন্য গাভীর শরীরের অংশবিশেষহেতু স্তন্যের সঙ্গে গাভীর অভেদ মনে করে গোবৎসের মাতৃদর্শনোৎকণ্ঠারই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে । এতে পূর্ব দৃষ্টান্ত থেকে এই দৃষ্টান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। বৎসতর অতি শিশু-বৎস, তজ্জন্য গোপালক তাকে বেঁধে রেখেছে বলে মার সাথে যেতে পারে নি । এরূপে বহু সময় অতীত হওয়ায় ক্ষুধায় কাতর, তাই পক্ষিশাবকের মাতৃদর্শনেচ্ছার থেকে গোবৎসের মাতৃ-দর্শনেচ্ছার বিশেষত্ব আছে আবার গোজাতী স্বভাবতই অন্য প্রাণি অপেক্ষা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহশীল, এ দৃষ্টান্তের এটিও অন্যতম বিশেষত্বের কারণ । তবু স্তন্য ও গাভীর কার্য-কারণত্ব ভেদ বিবেচনা করে এতেও অপরিতুষ্ট হয়ে অপর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করলেন — " প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা'' অর্থাৎ 'বিষণ্ণা প্রিয়া যেমন বিদেশগত প্রিয়ের দর্শন-কামনা করে ।' অন্য বহু শব্দ থাকলেও প্রিয়া ও প্রিয় এই শব্দদ্বয়দ্বারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি যে অব্যভিচারী প্রীতিসম্পন্ন তা' বুঝা যাচ্ছে । যাতে বার্ধক্যেই হোক আর বাল্যেই হোক সহমরণাদি দেখা যায়, তাদৃশ কোন প্রিয়া যেমন তাদৃশ প্রিয় বিদেশগত হলে প্রিয়গত-জীবনা বলে বিষণ্ণা হয়ে তাঁর দর্শনেচ্ছা করে, তাকে একান্তভাবে সেবা করে সুখী করার বাসনা করে; তার আর অপর কোন হেতুই থাকে না, তদ্রূপ বৃত্রাসুরের মনও ভগবানের দর্শন ও সেবাই আকাঙ্ক্ষা করে, অপর কিছুই নয় । তারপর বল্লেন —

Scanned with CamScanner

"মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং, সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে,-ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥"
(ভাঃ-৬।১১।২৭)

'হে নাথ ! নিজ কর্মফলে সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান্ আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তথায় যেন আপনার ভক্তগণের সঙ্গে আমার সখ্য হয় । মায়াপরবশ আমার চিত্ত যেন দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্রে আসক্ত না হয় ।' এপ্রসঙ্গে শ্রীজীব লিখেছেন — "তদেতচ্ছুদ্ধপ্রেমোদগারময়ত্বেনৈব শ্রীমদ্বৃত্রবধোঽসৌ বিলক্ষণত্ব চ্ছ্রীভাগবতলক্ষণেষু, পুরাণান্তরেষু গণ্যতে, বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যত ইতি" (প্রীতিসন্দর্ভঃ - ৭২ অনুঃ)। অর্থাৎ "শ্রীবৃত্রাসুর মহাশয়ের এসব বাক্যে বিশুদ্ধ প্রেম উদগীর্ণ হয়েছে বলেই শ্রীমান্ বৃত্রের বধবৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ । এজন্য অন্যান্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণসমূহের মধ্যে বৃত্রাসুরবধ একটি অন্যতম লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছে । যেমন মৎস্যপুরাণে দেখা যায় — বৃত্রাসুরবধ-প্রসঙ্গ যাতে আছে — তাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ ।" শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র, তাই বৃত্রাসুরের শুদ্ধভক্তিময় স্তব কে লক্ষ্য করেই পুরাণান্তরে উক্তরূপ লক্ষণ করা হয়েছে । শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং পরতত্ত্বের চরমসীমা হয়েও অন্যাভিলাষশূন্য শুদ্ধভক্তি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত পয়ারানুবাদও করেছেন —

Scanned with CamScanner

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

অয়ি নন্দতনুজ ! বিষম-সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, তোমারই কিঙ্কর আমাকে কৃপা করে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ চিন্তা কর ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ৫ম সংখ্যক শ্লোকটি পাঠ করার হেতু উল্লেখ করে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বল্লেন —

"অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তি দান ।
আপনাকে করে সংসার-জীব অভিমান ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্য-সিন্ধু আরও সমধিক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তিনি নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অভিমান করে এই পঞ্চম শ্লোকটি পাঠ করলেন । জীবশিক্ষার নিমিত্ত করুণার সোপানে প্রভুর এই যে অবতরণ — এতেই তাঁর ভগবত্তার চরম বিকাশ । জীবকুল যত ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভজনের দ্বারা সত্যের দিকে, আনন্দের দিকে উন্নীত হয়; ততই যেমন তার

"ধন, জন নাহি মাগোঁ — কবিতা সুন্দরী ।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি ॥"৪॥

Scanned with CamScanner

জীবত্বের বিকাশ, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ যতই মিথ্যার দিকে, দুঃখের দিকে, বন্ধনের দিকে নেবে আসেন, ততই তাঁর ভগবত্তার বিকাশ। কারণ ভক্তের প্রেম-ব্যতীত ভগবানের অন্তরে কামনার তরঙ্গ জাগাতে পারে, এমন কোন বস্তুই বিশ্বজগতে নেই। প্রেমের কারণেই করুণার সোপানে তাঁর এতদূর অবতরণ !

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাই, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন গোপ-গোপীর গৃহে দধি, নবনীতাদি চুরি করে খেয়েছেন। চুরি মানুষ কখন করে ? যখন কোন বস্তুতে তার খুবই লোভ হয় এবং স্বাভাবিক উপায়ে সেই লোভনীয় বস্তুটি সে পায় না; অথচ লোভটি প্রবল হয়ে বিচার, বুদ্ধি ও বিবেককে যখন লোপ করে দেয়, তখনি মানুষ চুরি করে থাকে। আত্মারাম, আপ্তকাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীর প্রেমে বশীভূত হয়ে করুণার সোপানে কতদূর নেমেছেন, এই নবনীত চৌর্য্যাদিই তার সাক্ষী। তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অভিমান জীব-শিক্ষার সোপানে তাঁর চরম অবতরণেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমতঃ বলছেন — "অয়ি নন্দতনুজ ! আমি বিষম সংসার-সিন্ধুতে নিপতিত।' 'অয়ি নন্দতনুজ !' সাধা-রণতঃ স্ত্রী-জাতীর এরূপ সম্বোধন হয়ে থাকে। পুরুষ-জাতির পক্ষে 'হে নন্দতনুজ !' এরূপ সম্বোধনই দেখতে পাওয়া যায়। এতে বুঝতে হবে শ্রীগৌরাঙ্গের এই দৈন্যভাব রাধাভাবের ভিতর দিয়েই অভিব্যক্ত হচ্ছে। রাধাভাব বিভু, তাই তাঁর মহাভাবের ভিতর দিয়ে সব ভাবই অভিব্যক্ত হতে পারে। এবং

Scanned with CamScanner

তাতে যেসব ভাব ওঠে, তার একটা সুন্দর সমন্বয়ও থাকে। শ্রীগৌরলীলায় মহাপ্রভুর অবিচ্ছিন্ন রাধাভাবের আস্বাদনধারাই চলেছিল। ভাবের সমন্বয়-বিষয়ে বলা যেতে পারে, যেমন মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের নিকট ভাগবতে ধ্রুব-চরিত্র ও প্রহ্লাদ-চরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করছেন —

"গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু কৃষ্ণভাব যত ॥
ধ্রুবের চরিত্র আর প্রহ্লাদ-চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ধ্রুবচরিত্র শ্রবণকালে ধ্রুবমহাশয় যখন বিপুল অনুরাগ-ভরে শ্রীহরিকে ডাকছেন, তখন মহাপ্রভুরও অনুরাগিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরাগের কথা মনে হচ্ছে। প্রহ্লাদ-চরিত্র শ্রবণে — প্রহ্লাদ মহাশয় যখন অসুরের দ্রোহরূপ বিঘ্নাদি জয় করছেন, বিষও তাঁর নিকট অমৃতের কাজ করছে; রাধাভাবে মহাপ্রভুর মনে হচ্ছে — 'কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আমাকেও এমনিভাবে ঘরের বাধা, বনের বাধা, শাশুড়ী-ননদের বাধা, লোক-ধর্ম, কুলধর্মের বাধাকে জয় করতে হবে। রমণী-জীবনের কলঙ্ক-বিষও কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত আমার কাছে অমৃতের ন্যায় স্বাদু মনে হবে।' রাধাভাবের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধকাবেশের উক্তির এই শ্লোকগুলিরও এভাবেই সমন্বয় হবে। যেমন এশ্লোকে 'অয়ি নন্দতনুজ ! তোমার দীনা কিঙ্করী আমি অতি বিষম গৃহ-

Scanned with CamScanner

কারাগারে পড়ে আছি, কৃপা করে তুমি এই দীনা দাসীকে তোমার পাদপঙ্কজের ধূলি-সদৃশ মনে ক'রো ইত্যাদি ।

যা' হোক, এশ্লোকে 'অয়ি নন্দতনুজ' সম্বোধনের মধ্যে প্রার্থনার একটি নিগূঢ় রহস্যও নিহিত রয়েছে । 'তনুজ' শব্দের অর্থ 'আত্মজ' । পিতার ঔরসে এবং মাতৃশোণিত-সহযোগে যার জন্ম হয় তাকেই তনুজ বা আত্মজ বলা হয় । শ্রীভগবানের জন্ম কি সেরূপ ? তিনি তো সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ । জীবের ন্যায় তাঁর দেহ তো পিতৃ-ঔরসে এবং মাতৃশোণিতে সৃষ্টি নয় । তবে তাঁকে 'নন্দতনুজ' বলা হয় কেন ? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপাদ শুকমুনিও বলেছেন — "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ।" 'মহামনা শ্রীনন্দের আত্মজ-উৎপন্ন হলে তিনি পরমানন্দ লাভ করলেন ।' এশ্লোকের তোষণী টীকায় লিখিত আছে — "অত্রাত্মজত্বমুৎপন্নত্বমাত্মজত্বেনোৎপন্নত্বমিত্যর্থত্রয়ং প্রত্যেকান্বয়াভ্যাং ব্যজ্যতে নীলোৎপলবদিতি ।" অর্থাৎ "আত্মজ উৎপন্নে" এই অংশের অর্থ বুঝতে হলে ঐ দু'টি শব্দের অর্থ এবং পরস্পরের কি সম্বন্ধ তা' বুঝা প্রয়োজন । যেমন 'নীলোৎপল' বুঝতে হলে নীল কাকে বলে, উৎপলই বা কি এবং নীল রংটি উৎপলের সহিত কিভাবে অন্বিত; তা' বুঝা দরকার । নচেৎ নীলোৎপল কি তা' জানা যায় না । শ্রীগীতায় শ্রীভগবান শ্রীমুখে অর্জুনের প্রতি বলেছেন —

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ।।" (৪।৯)

Scanned with CamScanner

'হে অর্জুন। যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম-কর্মের তত্ত্ব জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্ম-কর্মাদি প্রাপ্ত হন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।' এশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখেছেন — "মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্ত-মৎসমাশ্রয়ণবিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামাশ্রিত্য মদেক-প্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি।" অর্থাৎ "আমার দিব্য বা অপ্রাকৃত জন্ম-কর্মাদির যথার্থ-তত্ত্বের জ্ঞান হলে তৎক্ষণাৎ আমার আশ্রয়ের বিরোধী পাপাদি অনর্থসমূহ বিনষ্ট হয় এবং তিনি আমার চরণাশ্রয়ে আমার প্রীতিসাধনপূর্বক এজন্মেই আমার প্রাপ্ত হন।" সুতরাং যাঁর জন্মের তত্ত্বটি জানলেই আর জন্ম হয় না, তাঁর জন্ম যে জীবের জন্ম-অপেক্ষা অতীব বিলক্ষণ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁর আত্মজ হওয়ার সংক্ষিপ্ত রহস্য এই যে, এক-মাত্র ভক্তের প্রেমই শ্রীভগবানের অন্তরে কামনার তরঙ্গ জাগাতে পারে। কোন বাৎসল্য-প্রেমিক ভক্ত শ্রীভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করার এবং লালন-পালন করার নিমিত্ত যখন তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর প্রেমোৎকণ্ঠা শ্রীভগবানের চিত্তেও সন্তানরূপে ঐ প্রেমিকভক্তের বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত তীব্র উৎকণ্ঠা জাগিয়ে দেয়। তখন শ্রীভগবান্ অজ হয়েও তাঁর নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহেই জন্মানুকরণ করেন এবং শিশুভাবে পিতা-মাতার বাৎসল্য-রসাস্বাদন করেন। বস্তুত পিতার ঔরসে এবং মাতৃ-শোণিতে তাঁর দেহ গঠিত হয় না। এভাবে নিত্যসিদ্ধ মাতা-পিতা নন্দযশোদার তিনি নিত্যকালই

Scanned with CamScanner

'আত্মজ' হয়ে আছেন। এতে শ্রীভগবানের ভক্তের প্রেমরসাস্বাদনের একটি শাশ্বত আকাঙ্ক্ষারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ভক্তেরই যে ভগবানকে পাওয়ার প্রয়োজন তা' নয়, ভগবানেরও ভক্তকে পাওয়ার বিপুল প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে চাওয়া এবং পাওয়ার প্রয়োজন দু'দিকেই প্রবল, সেখানে বস্তুপ্রাপ্তি অতি সুলভ হয়ে থাকে। যেখানে প্রয়োজন একদিকের সেখানেই প্রাপ্তি দুর্লভ হয়। মহাপ্রভু বল্লেন — 'অয়ি নন্দতনুজদ্রু! তুমি প্রেমরসাস্বাদন-লোলুপ, সুতরাং আমারই যে তোমাকে প্রয়োজন তা' নয়, কিন্তু তোমারও আমাকে পাবার প্রয়োজন রয়েছে।' এটিই এসম্বোধনের ব্যঞ্জনা।

'অয়ি নন্দতনুজ! আমি বিষম সংসার-সিন্ধুতে নিপতিত।' সত্যই এই সংসারসিন্ধু অতি বিষম। বিষম অর্থে — দুঃসহ, ক্লেশকর ও বিষতুল্যদাহক। যাঁর নামোচ্চারণমাত্রে সংসারসিন্ধু শুষ্ক হয়ে যায়, যাঁর দর্শনমাত্রে বিশ্বমানব সংসারসিন্ধু হেলায় পার হয়ে প্রেম পেয়ে ধন্য হয়েছেন, সেই ভগবান্ মহাপ্রভু সংসার-সাগরের বিষমতা শিক্ষা দিয়ে জীবকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই সংসারসিন্ধুর বিষমতা বর্ণনা করেছেন —

"সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম,-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য,
চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি পদাবলম্বনম্॥"
(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-৫৪)

Scanned with CamScanner

'হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ! আমি সংসাররূপ দুঃখসিন্ধুতে নিপতিত, কাম, ক্রোধাদি নক্রমকরের দ্বারা কবলীকৃত, দুর্বাসনারূপ রজ্জুতে আবদ্ধ, এরূপ নিরাশ্রয় আমায় তোমার শ্রীচরণ-তরণীর আশ্রয় প্রদান কর ।' এসংসার দুঃখের সিন্ধু । এসিন্ধুর মাঝখানে নিপতিত জীবকুল একান্তই নিরাশ্রয় । যদি কেউ মনে করেন, সংসারে তো মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবাদি বহু আশ্রয়ই আছেন, এখানে জীবকুল নিরাশ্রয় কেন ? এজন্যই বিশাল সিন্ধুর সঙ্গে সংসারকে তুলনা করা হচ্ছে । সহস্র মানব যদি দুস্পার সিন্ধুর মাঝে পড়ে হাবুডুবু খান, তবে কি তাঁরা একে অন্যের আশ্রয় হতে পারেন । সবারই তো দুরবস্থা সমান । এরূপ দুরবস্থায় আবার কাম, ক্রোধাদি, ষড়রিপু নক্র-মকরের ন্যায় জীবকুলকে সতত চিবিয়ে চিবিয়ে ভক্ষণ করছে । শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয়-ব্যতীত বা ভক্ত ও ভক্তির কৃপা-ব্যতীত এদের হাত থেকে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী কারো অব্যাহতি নেই । এপ্রসঙ্গে আমরা দু'চারটি আখ্যায়িকার অবতারণা করছি ।

তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়ে তার নিধনের উপায় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা বল্লেন — একমাত্র শ্রীমন্মহাদেবের ঔরসজাত সন্তানই তারকাসুরকে নিধন করতে পারবেন । এদিকে দক্ষযজ্ঞে সতীদেবী দেহত্যাগ করে হিমাচলের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মহাদেবের আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্টও করেছেন । কিন্তু শ্রীমন্মহাদেব এখন এক এমনি

Scanned with CamScanner

অখণ্ড সমাধিতে নিমগ্ন আছেন, কতকালে তাঁর এই সমাধি ভাঙ্গবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং দেবগণ যদি কোন উপায়ে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেন এবং পার্বতীকে বিবাহ করার নিমিত্ত তাঁকে অনুনয় করে সম্মত করতে পারেন; তবেই তারকাসুর-নিধনের উপায় হতে পারে।

ব্রহ্মার যুক্তিতে দেবগণ কামদেবের নিকট গিয়ে মহা-দেবের সমাধি-ভঙ্গের জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানালেন। কামদেব অভিমান-বশতঃ দেবগণের নিকট মহাযোগীশ্বর শ্রীমন্মহাদেবের সমাধি-ভঙ্গ করার যে তাঁর শক্তি বা সাহস নেই — একথা বলতে পারলেন না। দেবগণের প্রার্থনা অঙ্গীকার করে তিনি মহাদেবের নিকট গমন করলেন। গমন-সময়ে মদন মনে মনে চিন্তা করছেন, — 'আজ যাঁর অনিষ্ট-সাধনের জন্য যাচ্ছি, তাতে মনে হয় আমার বিনাশ অনিবার্য। তাই জীবন-সায়াহ্নে একবার আমার শক্তির পরিচয়টা বিশ্ববাসীকে দিয়ে যাব।' এই চিন্তা করে মদনদেব তাঁর ফুলধনুতে পঞ্চবাণ-যোজনা করত বিশ্বকে লক্ষ্য করে বাণ ত্যাগ করলেন। সেই পঞ্চবাণের পীড়নে বিশ্ববাসী কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ন্যাসী সকলেই বিমোহিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র শ্রীহরির শরণাগত ভক্ত-ব্যতীত কেহই রক্ষা পান নি। মহাকবি তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে এই আখ্যানটি বর্ণনা করে এপ্রসঙ্গে লিখেছেন —

"ধরা ন কাহু ধীর, সবকে মন মনসিজ হরে।
যাহি রাখে রঘুবীর, তে উবরে তেহি কালমহঁ ॥"

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ 'তৎকালে কেউই ধৈর্য-ধারণ করতে সক্ষম হন নি, শ্রীভগবান্ যাঁকে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন।'

ক্রোধের তাড়নায় মহাতেজস্বী দুর্বাসা ঋষি পর্যন্ত ভক্ত-শ্রেষ্ঠ মহারাজ অম্বরীষকে বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হয়েছিলেন; মহাভক্ত অম্বরীষ কিন্তু ভক্তির প্রভাবে সবই সহ্য করে মহা-ধীরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঋষিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে অঙ্গীকার না করায় বিশ্বামিত্র ক্রোধান্ধ হয়ে বশিষ্ঠের শত সন্তানকে নিধন করেছিলেন, কিন্তু ভক্তির প্রভাবে মহর্ষি বশিষ্ঠ সবই সহ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির ক্রোধ যদিও সাধারণ মানুষের ক্রোধের ন্যায় তমগুণের পরিচায়ক নয়; কোন উদ্দেশ্যবিশেষ সিদ্ধির জন্যই তা' প্রকাশিত হয়েছিল, তবু তাঁরা স্বয়ং আচরণ করে বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিয়েছেন, সংসারসিন্ধুতে বিচরণ-শীল এসব কাম, ক্রোধাদি নক্রমকরের শক্তি কত ব্যাপক!

অর্থ-সম্পদাদির লোভকেও শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত-ব্যতীত কেউ সহসা জয় করতে সমর্থ হন না। একদা লক্ষ্মী-নারায়ণ পরস্পরের মধ্যে প্রণয়-কলহ হচ্ছিল। লক্ষ্মীদেবী বলছিলেন, তোমার থেকে বিশ্বের মানুষ আমাকেই বেশী আকাঙ্ক্ষা করে।' নারায়ণ বল্লেন — 'আচ্ছা, পরীক্ষা করেই দেখা যাক। চল, আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমিও সেখানে গিয়ে নিজ প্রভাব বিস্তার কর। দেখ কার জয় হয়।

Scanned with CamScanner

ভগবান্ শ্রীনারায়ণ সাধুবেশে এক বড় শেঠের ধর্মশালায় গিয়ে মধুর স্বরে নামকীর্তন আরম্ভ করলেন। কীর্তন শুনে শেঠ আকৃষ্ট হয়ে বল্লেন — 'সাধুবাবা ! আমার এই ধর্মশালায় কয়-দিন থেকে কীর্তন-শ্রবণ করিয়ে আমায় ধন্য করুন।' ছদ্মবেশী শ্রীনারায়ণ বল্লেন — 'আপনার এই ঘরে থেকেই কীর্তন করতে চাই, কিন্তু যদি অন্য ঘরে যেতে বলেন, আমি যাব না।' শেঠজী বল্লেন — 'না না আপনি এঘরেই যতদিন ইচ্ছা থাকুন, অন্য যাত্রী যতই টাকা দিক, এ ঘর অন্যকে দেব না।' শ্রীনারায়ণের ইচ্ছা বুঝে কমলাদেবী এক রাজকন্যার বেশধারণ করে গিয়ে ঐ ঘরটিই ভাড়া চাইলেন। শেঠজী বল্লেন, 'ওখানে এক সাধুবাবা কীর্তন করেন, আপনি অন্য ঘর নিন।' কমলা বল্লেন — 'না আমার ঐটিই পছন্দ, সাধুকে অন্য ঘরে সরিয়ে যদি আমায় ঐ ঘরটা দেন, তো রোজ হাজার টাকা করে ভাড়া দিতে পারি। শেঠজী বল্লেন — 'রোজ হাজার টাকা !! আচ্ছা, একটু দাঁড়ান, সাধুবাবাকে বুঝিয়ে দেখি। সাধুর নিকট এসে শেঠ বল্লেন — 'মহারাজজি, একটি বিশেষ কারণে আপনাকে অন্য ঘরে সরতে হবে।' নারায়ণ বুঝলেন, কমলাদেবী এসে গেছেন। বল্লেন — আপনি তো বলেছেন এঘর অন্য কাউকে দেবেন না, এখন আমায় সরতে বলছেন কেন ? শেঠজী বল্লেন — দেখুন মহারাজ, আমরা সংসারি মানুষ, এক রাজকন্যা এঘরের জন্য রোজ হাজার টাকা ভাড়া দিতে চান। অনর্থক বিষয়ীমানুষের এতগুলো টাকা লোকসান করে আপনার কি লাভ হবে বলুন। আপনাকে

Scanned with CamScanner

এর চাইতেও ভালো ঘর দেবো । দয়া করে সেই ঘরে যান ।' সাধু — 'শেঠজি ! আপনি নিজেই বলেছেন, যত টাকাই লোকে দিক, অন্যকে এ ঘর দেবেন না । এখন আবার টাকার মোহে পড়ে আমায় সরতে বলছেন ?' শেঠ — 'মহারাজজি ! আমি কি জানি, যে কেউ এ ঘরের জন্য রোজ হাজার টাকা দিতে পারে, তাই বলেছিলাম । আমরা সাধারণ মানুষ, এতগুলো টাকার মোহ ছাড়তে পারি না । আপনারই বা অন্য ঘরে গেলে ক্ষতিটা কি আছে ? সুতরাং জিদ না করে ভাল ঘর দিচ্ছি সেই ঘরে যান । নচেৎ আপনার জিনিষ-পত্র বাইরে বের করে ঘর খালি করতে বাধ্য হব ।' দেখতে দেখতে লক্ষ্মীনারায়ণ উভয়েই অন্তর্হিত হলেন — কমলার জয় হল ।

শ্রীনারায়ণ বল্লেন — দেবি ! এমনি আর এক জায়গায় চল যাই । সেখানেও যদি তোমার জয় হয়, তবেই আমার সম্পূর্ণ পরাভব হবে । নারায়ণ এবার ঐরূপ সাধুবেশে এক পরম ভক্তের গৃহে গমন করলেন । সাধুর কীর্তন-শ্রবণে ভক্তের আনন্দের সীমা নেই । ভক্ত পরমাদরে তাঁর গৃহের একটি কক্ষে কয়দিন থেকে কীর্তন শুনিয়ে ধন্য করার জন্য সাধুর চরণে নিবেদন করলেন । সাধু বল্লেন — 'কেউ যদি আপনাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে এই ঘরটি ভাড়া চায়, আপনি যদি তা' না দেন, তবেই আমি এঘরে থাকতে পারি । ভক্ত বল্লেন — 'কোটি টাকা দিলেও এ ঘর অন্যকে দেবো না ।' কমলা রাজকন্যার বেশে ভক্তকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে ঘরটি ভাড়ায় চাইলেন ।

Scanned with CamScanner

ভক্ত বল্লেন — 'আরে যান যান মহারাণী ! রাখুন আপনার টাকা। ঐ ঘরে এক মহাত্মা আছেন, তাঁর কাছে আমি যে পরমার্থিক সম্পদ্ পেয়েছি, আপনার এ তুচ্ছ অর্থ তার কাছে কোন্ ছার !' এবার শ্রীনারায়ণ জয়ী হলেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ দেখিয়ে দিলেন, ভক্তিদেবীর কৃপা-ব্যতীত তাঁরা নিজেরাও সংসারসিন্ধুর এসব নক্রমকরের হাত থেকে কাউকে মুক্ত করার ইচ্ছা করেন না।

'মোহ' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ চিত্রকেতুর উপাখ্যান একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। অপুত্রক মহারাজ চিত্রকেতু সন্তান-লাভের মোহে পড়ে এক কোটি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তানাদি হয় নি। একদা যদ্দৃচ্ছাক্রমে নিজ গৃহে সমাগত মহর্ষি অঙ্গিরাকে পেয়ে রাজা তাঁর নিকট একটি পুত্রবর কামনা করলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা মহারাজকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুত্র-সন্তানাদি মোহের বস্তু, তাঁকে বহু দুঃখ দেবে। তবু রাজা সন্তানের মোহ ছাড়তে না পেরে ঋষির নিকট পুত্র লাভেরই কামনা জানালেন। মহর্ষি অঙ্গিরা পুত্রেষ্টি যাগ করে রাজার প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতিকে যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়ে গেলেন। মহর্ষির কৃপায় রাজার পুত্রসন্তান লাভ হল। পুত্রের মোহে রাজা আর কৃতদ্যুতির গৃহ থেকে অপর কোন রাণীর নিকটই যান না। অবশেষে মাৎসর্যের জ্বালায় জ্বলিতা অন্যান্য রাণীরা যুক্তি করে রাজপুত্রকে বিষ দিয়ে মেরে ফেল্লেন। রাজার শোক-দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। ইত্যবসরে মহর্ষি অঙ্গিরা দেবর্ষি নারদের সঙ্গে রাজার গৃহে আগমন করলেন। শক্তি-সঞ্চার করে তাঁরা

Scanned with CamScanner

মৃত-পুত্রের মুখে তত্ত্ব বলিয়ে শোকার্ত রাজার মোহ নাশ করলেন। রাজা সংসারের মোহ ত্যাগ করে মহৎ-কৃপায় পরাভক্তি লাভ করে ধন্য হলেন। এভাবে মদাদি সম্বন্ধেও জানতে হবে। মহৎ-কৃপামূলা ভক্তির আশ্রয়-ব্যতীত ঘোর সংসারসিন্ধুতে বিচরণশীল কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরের হাত থেকে রক্ষা পাবার অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন, ভক্তির আশ্রয়ে এই অশেষ দুঃখ-প্রদায়ী কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকর শত্রুতা ত্যাগ করে মহামিত্রের ন্যায় কার্য করে থাকে। তখন এগুলো ভক্তের ভগবদ্ভজনেরই সহায়ক হয়। যথা —

"কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য দম্ভসহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
কৃষ্ণ-সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি-জনে,
লোভ সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

Scanned with CamScanner

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ষড়্‌রিপুর মধ্যে মাৎসর্যের কোন স্থান খুঁজে পান নি । কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই দেখা যায় — **'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'** ভক্তি নির্মৎসর সৎগণেরই অনুষ্ঠেয় । "পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যম্" মাৎসর্য বলতে অন্যের উৎকর্ষ সহ্য করতে না পারা । এই মাৎসর্য নামক হীনবৃত্তিটি যে হৃদয়ে অবস্থান করে, সেখানে তার প্রণয়িনী প্রতিষ্ঠাশাও এসে উপস্থিত হয় । মাৎসর্যরূপ চণ্ডালের ঔরসে এবং প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে হিংসা ও অসূয়া এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। এদের সবার ভীম-তাণ্ডব-নর্তনে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় । সুতরাং সে চিত্তে আর ভক্তির আলোক-সম্পাত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না ।

এই বিষম সংসারসিন্ধুতে নিপতিত জীবকুলের হস্তপদ আবার দুর্বাসনারূপ নিগড়ে আবদ্ধ । "দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য" এ নিগড় বা বন্ধন সাধারণ রজ্জু-বন্ধনের মত নয়, এ বড়ই ভয়ঙ্কর , সজীব এবং সক্রিয় । একটি বড় নদীর তীরে একটি পল্লীগ্রাম । নদীতীরের পল্লীর লোকেরা প্রায়ই সাঁতারু হয় এবং বন্যায় নদীর জলে কাষ্ঠ প্রভৃতি ভেসে এলে তারা তোলে । একদিন ভীষণ বন্যা, কয়েকজন সাঁতারু নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে কিছু ভেসে যাচ্ছে কিনা । হঠাৎ তারা দেখছে নদীর মাঝখানে কালো রং-এর কি একটা জিনিষ ভেসে যাচ্ছে ঠিক কম্বলের মতো । একজন সাঁতারু কম্বল ভেবে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ওটাকে ধরেছে এবং ওর সাথে নদীর স্রোতে ভেসে

Scanned with CamScanner

যাচ্ছে। নদীর তীরে থেকে তার সাথীরা বলছে — 'ওহে ওটাকে উঠাও, যদি না পারছ তো ছেড়ে দাও, ভেসে যাচ্ছ যে।' সে বলছে — 'ভাই! আমি তো কম্বলটাকে ছাড়ছি, কিন্তু কম্বল যে আমায় ছাড়ছে না।' আসলে ওটা কম্বল নয়, একটা অর্ধমৃত ভাল্লুক! ঝড়বৃষ্টি, শিলাপাতে অর্ধমৃত অবস্থায় নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল। কম্বল মনে করে লোকটা যখন তাকে ধরল, তখন সেও আধার পেয়েছে ভেবে লোকটাকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তেমনি এ ভবনদীর স্রোতে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয়সুখ ভেসে যাচ্ছে, মায়াবদ্ধ মানব তাদের পরম আকাঙক্ষণীয় ভোগ্যবস্তু ভেবে তাদের জড়িয়ে ধরছে। তখন সেই শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ও দুর্বাসনারূপ ভয়ঙ্কর বাহু-নিগড়ে তাকে জড়িয়ে ধরছে। পরে রোগ, শোক, ত্রিতাপাদি দুঃখ পেয়ে তাকে ছাড়বার চেষ্টা করলেও সে আর ছাড়ছে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন — 'হে নন্দনন্দন! আসলে আমি তোমার কিঙ্কর বা নিত্যদাস। তোমার শ্রীচরণ ভুলে মায়াবদ্ধ হয়ে আমার এই দুরবস্থা।'

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই-দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ)

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন হতে পারে, নিত্যকৃষ্ণদাস জীব, কেন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলল বা কখন ভুলল ? কারণ যার কৃষ্ণ-উন্মুখতা থাকে, তার কৃষ্ণকে ভুলা কি সম্ভব ? তদুত্তরে বলা হচ্ছে — মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল থেকেই কৃষ্ণ বহির্মুখ ! জীব সংখ্যায় অনন্ত । এই জীব দু'শ্রেণীর । পরতত্ত্বজ্ঞান ও তদীয় জ্ঞানাভাব-বশতঃ যথাক্রমে একশ্রেণী অনাদিকাল থেকেই ভগবদুন্মুখ; অপর একশ্রেণী অনাদিকাল থেকেই ভগবদ্বহির্মুখ । "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যা তটস্থাঃ শক্তয়ঃ । তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্ । একোবর্গঃ অনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎপরাঙমুখঃ স্বভাবতঃ তদীয় জ্ঞানভাবাৎ তদীয় জ্ঞানাভাবাচ্চ ।" (পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ-৪৪ অনুঃ)।

ভক্তকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা-সাপেক্ষ পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যব্যতীত অনাদি কৃষ্ণবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের এবিষম সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়ার অন্য কোন উপায়ই নেই । তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার নিমিত্ত নিজেকে সংসারী জীব অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কামনা করতে গিয়ে বল্লেন — **'কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়'** 'হে ভগবন্ ! কৃপা করে আমায় তোমার শ্রীপাদপঙ্কজস্থিত ধূলিকণার ন্যায় চিন্তা কর ।' প্রথমেই বল্লেন — **'কৃপয়া'** কৃপা-ছাড়া গতি নেই । ইক্ষুদণ্ড স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হলেও পেষণ-ব্যতীত যেন তার রস নিঃসৃত হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ করুণারসপূর্ণ হলেও ভক্তের উৎকণ্ঠা-ব্যতীত সেই করুণারস নিঃসৃত হয় না । এজন্যই

Scanned with CamScanner

ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির নিমিত্ত আর্তি বা উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভজন-সাধনের অপেক্ষা। আবার ভগবৎকৃপা-ব্যতীত সাধকের কেবল সাধন-প্রযত্ন কখনই অভীষ্ট-প্রেমদানে বা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদানে সমর্থ হয় না। কৃপাতেই সাধনার পূর্ণ সাফল্য। তাই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাস্তবে দৃষ্ট হয়, যাঁরা শ্রীভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করে থাকেন, তাঁরাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভের উত্তরাধিকারী।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ-১০।১৪।৮)

ব্রহ্মা বল্লেন — 'হে প্রভো! আপনি গুণাধিষ্ঠাতা, অখিল কল্যাণ-গুণনিধি; সুতরাং আপনার গুণাবলী গণনায় কেউই সমর্থ নন। অতএব কবে আপনার করুণা বর্ষিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করে যিনি অনাসক্তচিত্তে নিজকৃত-কর্মফল ভোগ করতে করতে কায়মনোবাক্যে আপনার নমস্কার বিধানপূর্বক ভজন-জীবন যাপন করেন, পুত্রের পিতৃ-সম্পদ্ প্রাপ্তির ন্যায় তিনি আপনার শ্রীচরণ-প্রাপ্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন।'

প্রভু বলছেন — 'হে ভগবন্! তুমি কৃপা করে তোমার এই কিঙ্করকে তোমার পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিকণাসদৃশ চিন্তা কর, যাতে তোমার এই দীন সেবক তোমার সেবা লাভে ধন্য বা কৃতার্থ হতে পারে।' ধূলিকণা যেমন সব সময়ই চরণে লগ্ন হয়ে থাকে, তদ্রূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পরাগের ন্যায় সতত লগ্ন

Scanned with CamScanner

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

হয়ে থাকার কামনা করছেন ! সাধকেরও আক্ষেপ জাগা উচিৎ- ঐ চরণে মন কেন সতত পড়ে থাকে না ! কেন দুষ্ট মন ঐ আনন্দময়-চরণ ছেড়ে ঘৃণ্য বিষয়রসে সতত ডুবে থাকতে চায়? মাদৃশ জীবের কি দুর্দৈব, স্বপ্নের ভিতরেও বিষয় । কবে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে মন কৃষ্ণচরণে পড়ে থাকবে — সেই অবস্থা লাভের জন্য প্রাণ কাঁদা উচিৎ । প্রভু বল্লেন — 'হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার কিঙ্কর !' 'কিং করোমি' 'কিং করোমি' অর্থাৎ 'আমি কি সেবা করব, কি সেবা করতে পারি' — সতত এপ্রকার উৎকণ্ঠাময় সেবা-বাসনা যার মনে জাগ্রত, তারই নাম **কিঙ্কর** । এরূপ সেবা-বাসনা জাগলে ধীরে ধীরে চঞ্চল মন বিষয় ত্যাগ করে অভীষ্ট-চরণে নিবিষ্ট হয়ে থাকে এবং শ্রীভগবানও তাকে শ্রীচরণ-ধূলিকণার ন্যায় শ্রীচরণ থেকে ত্যাগ করার ইচ্ছা করেন না । প্রভু স্বয়ং এশ্লোকের অনুবাদ করে বলেছেন —

"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াঁছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম ।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন ॥" (চৈঃ চঃ) ॥৫॥

Scanned with CamScanner

হে ভগবন্ ! আমার এমন দিন কবে হবে — যখন তোমার নামগ্রহণে বিগলিত-অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হবে, বদন গদগদ-রুদ্ধ-বাক্যে এবং দেহ পুলকনিচয়ে পরিপূর্ণ হবে ? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এশ্লোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় লিখেছেন —

"পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদগম ।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ।।" (চৈঃ চঃ)

প্রভুর দৈন্যবেগ ক্রমশই বর্ধিত হয়ে চলেছে । উচ্ছলিত দৈন্যে চিত্তে তাঁর বিপুল উৎকণ্ঠার উদ্রেক । কোন বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত সুতীব্র আকাঙক্ষা বা ব্যাকুলতাকেই 'উৎকণ্ঠা' বলা হয় । এই ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠাই ভক্তির প্রাণ । উৎকণ্ঠাই ভক্তের অভীষ্টসিদ্ধির মহাসাধক । শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার নিমিত্ত নীলাচল-লীলায় যে আর্তি-উৎকণ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, তা' অভীষ্ট-প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত সাধকগণের সম্মুখে সুমেরুর ন্যায় আদর্শরূপে বিরাজ করছে । যা' অনন্তকাল সাধকগণকে এক মহাব্যাকুলতায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে ।

আমরা কোন বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যদি যথার্থ উৎকণ্ঠিত হই, তবে নিশ্চয়ই সে বস্তু পাব, এটি যেমন সত্য; উৎকণ্ঠা-বিহীন হয়ে বস্তু পেলেও তা' আস্বাদন করতে পারব না; এটিও তেমনি সত্য । কারণ নিদাঘ পীড়িত পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট সুস্বাদু পানক যেমন পরম তৃপ্তিদায়ক হয়, যার পিপাসা নেই, তার আদৌ পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধই নেই । আস্বাদনের

Scanned with CamScanner

কথা দূরে থাক। সাধকজগৎ থেকে সিদ্ধিজগতে, এমন কি নিত্য-সিদ্ধগণেরও অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। সাধক ভজনসম্পদ্ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত বা ব্যাকুলিত না হলে যেমন অনুরাগময় ভজন-জীবন লাভ করতে পারেন না, সিদ্ধমহাত্মাগণেরও তদ্রূপ প্রেমের সঙ্গে উৎকণ্ঠার যোগ না হলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। নিত্যসিদ্ধগণেরও প্রবল উৎকণ্ঠা না জাগলে কৃষ্ণকে সম্যক্ বশীভূত করা সম্ভবপর হয় না।

যেমন মাতা যশোমতী দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার নিমিত্ত কৃষ্ণের কটিদেশে বারবার রজ্জু যোজনা করেও বন্ধন করতে পারছেন না, প্রতিবারই দু'অঙ্গুলি রজ্জু কম হচ্ছে। শ্রীল গোস্বামিপাদ বল্লেন — প্রতিবার দু'অঙ্গুলি রজ্জু কম হয়ে দু'টি তত্ত্বের ন্যূনতা সূচনা করে দিচ্ছে। "স্তিতেঽপি প্রেম্ণি বৈয়গ্র্যবিশেষ তজ্জাত তৎকৃপাবিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামূনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ। অতএব 'দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে' ইতি বক্ষ্যতে" (ভাঃ-১০।৯।১৫ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা)। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে নিজের সম্পূর্ণ বশীভূত করার জন্য যদি পরিপূর্ণ ব্যগ্রতা বা উৎকণ্ঠা না থাকে এবং সেই উৎকণ্ঠার অভাবে যদি শ্রীভগবানের কৃপার বিকাশ না হয়, তা' হলে প্রেম পরিপূর্ণ হলেও এ দু'য়ের অভাবে প্রেমিকভক্ত শ্রীভগবানকে স্বীয় আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম হন না। শ্রীভগবানকে বশীভূত করার নিমিত্ত ভক্তের যে পরিমাণে ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়, শ্রীভগবানেরও তাঁর বশীভূত হওয়ার জন্য তদনুরূপ

Scanned with CamScanner

কৃপার বিকাশ হয় । যাঁদের ব্যগ্রতা বা উৎকণ্ঠার প্রকাশ হয় না, তাঁদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপারও বিকাশ হয় না, সুতরাং তাঁরা বিশুদ্ধ প্রেমবলে শ্রীভগবানকে বশীভূতের ন্যায় করিলেও সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পারেন না; তাঁদের বশীকরণের ন্যূনতা থেকে যায় । ভক্তের উৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণের কৃপা-ব্যতীত কিছুতেইএই ন্যূনতার পূরণ হয় না । তাই পরে যখন মা যশোমতীর ব্যগ্রতা প্রকাশিত হল, তখন তাঁর পরিশ্রম দেখে শ্রীকৃষ্ণের কৃপারও বিকাশ হল; অমনি বন্ধন-সম্পন্ন হয়ে গেল ।

ভবিষ্যোত্তরে দেখা যায় — শ্রীরাধারাণীও শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করেছিলেন । এজন্য বলা হয় শ্রীরাধা-দামোদর ।

"সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরব্ধয়া রাধয়া
প্রারভ্য ভ্রূকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্না নিবদ্ধোদরম্ ।
কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটুনি প্রথয়ন্তমাত্তপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্ ।।"

(ভবিষ্যোত্তরপুরাণ)

"একদা পুণ্যময় কার্তিকমাসে শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে বাসক-সজ্জিকা শ্রীরাধার কুঞ্জে উপস্থিত হতে না পেরে বিলম্বে এলে শ্রীমতী প্রণয়রোষভরে তাঁকে ভ্রূকুটি-চালনাপূর্বক স্বীয় কটিবন্ধন সুবর্ণময় রজ্জুতে বেঁধে ফেলেন । শ্রীকৃষ্ণ তখন মা যশোমতীর অনুষ্ঠিত উৎসবের নিমিত্ত যথাসময়ে শ্রীমতীর কুঞ্জে আসতে পারেন নি বলে বিলম্বের কারণ দেখালে শ্রীমতী বন্ধন-মোচন করে দেন । শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম সতত এতই বিপুল

Scanned with CamScanner

উৎকণ্ঠাপূর্ণ যে, এতে ব্যাকুলতা এবং তদনুরূপ কৃষ্ণকৃপাজনিত বশ্যতার অভাব কখনই হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে সততই বিশাল উৎকণ্ঠা-সিন্ধুতে ভাসমান তাই শ্রীকৃষ্ণমাধুরী অশেষ-বিশেষে আস্বাদন করলেও এই উৎকণ্ঠারই তৃষ্ণাময় স্বভাব-বশতঃ সাধকের কক্ষায় নেমে প্রীতির সহিত নামকীর্তনের সৌভাগ্য-কামনা করছেন। সাধক-জগতে শিক্ষা দিচ্ছেন, যাঁরা অনুরাগময় বা প্রীতিময় নামভজন-জীবন লাভ করছেন, তাঁরা যেন শ্রীভগবানকে পাওয়া-অপেক্ষাও কোন বৃহত্তর সাধন-সম্পদ্ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

প্রভু বল্লেন — 'হে ভগবন্! আমার এমন সৌভাগ্য কখন হবে — যবে তোমার নামকীর্তনকালে গলদশ্রুধারায় আমার নয়ন-যুগল ব্যাপ্ত হবে, গদগদ-বাক্যে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হবে এবং নিবিড় পুলকে এ দেহ ব্যাপ্ত হবে।' প্রভু শ্রীভগবানের নিকট সপ্রেম নামকীর্তনের কামনা জানাচ্ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের এই চারটি শ্লোকই শ্রীনামসঙ্কীর্তনবিষয়ক। কারণ তিনি এই কলিকালের যুগধর্ম নামকীর্তন-দ্বারেই প্রেম-প্রচার করে বিশ্বমানবকে ধন্য করেছেন। সবযুগেই নামকীর্তনের সমান প্রভাব বা অতুলনীয় মহিমা, সত্যাদিযুগের মানবের সহস্র সহস্র বৎসর পরমায়ু ও তদনুরূপ অটুট সাধনশক্তি থাকায় তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, 'কৃষ্ণ' বলে জিহ্বাটি একটু স্পন্দিত হলেই তত্তৎ যুগের ধ্যান, তপস্যাদি বিপুল আয়াসসাধ্য সাধন-অপেক্ষাও মানব কোটী কোটী গুণ ফললাভ করে ধন্য

Scanned with CamScanner

হতে পারবে । এই কলির মানুষ সর্বপ্রকারে দুর্গত ও সাধন-শক্তিহীন বলে তাঁরা নামের মহিমায় অনায়াসে বিশ্বাস-স্থাপন করলেন তাই শ্রীনামও স্বীয় মহিমা প্রকাশ করত কলিকালের যুগধর্ম হয়ে গেলেন ! সুতরাং এই কলিযুগে শ্রীনামকীর্তনের মহিমা প্রচারের দ্বারাই ভক্তগণের পরম ভগবৎ-পরায়ণতা সিদ্ধ হয়ে থাকে । "তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেনৈব পরম-ভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা ।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২৭৪ অনুঃ)।

আমরা বলেছি — অপরাধদুষ্ট-জিহ্বায় অনন্তমধুর শ্রীকৃষ্ণনামের রসমাধুর্যের আস্বাদন অনুভূত হয় না । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন — এত মধুর শ্রীহরিনাম-গ্রহণেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দ-পুলকিত হয় না — হায় ! তার হৃদয় লৌহসদৃশ কঠিন ।

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদগৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ।।" (ভাঃ-২।৩।২৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এশ্লোকে অশ্রু, পুলক ও স্বরভেদ এই ত্রিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের সহিত নামকীর্তনের প্রার্থনা শ্রীভগবচ্চরণে জ্ঞাপন করেছেন । শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় দাস্য-সখ্যাদি পঞ্চমুখ্য রতি-দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা হাস-করুণাদি সপ্ত গৌণরতিদ্বারা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ **'সত্ত্ব'** বলে থাকেন; এই থেকে সমুৎপন্ন ভাবসমূহকে **সাত্ত্বিক** ভাব বলা হয় ।

Scanned with CamScanner

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ-২।৩।১-২)

এই সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ অষ্টবিধ —

"তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥"
(ঐ-২।৩।১৬)

অর্থাৎ 'স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, ও প্রলয় এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব ।' এর মধ্যে **রোমাঞ্চ, স্বরভেদ** ও **অশ্রু** এই ত্রিবিধ সাত্ত্বিকভাবের সহিত নাম-কীর্তনের প্রার্থনা জানিয়েছেন মহাপ্রভু । আসলে ভাগবতী রতিই সর্বানন্দ-চমৎকারিতার হেতু, রতিই সুতরাং শ্রেষ্ঠ ভাব; রতি ব্যতিরেকে ঐ সকল ভাব দেহে উদিত হলেও তাকে সাত্ত্বিকভাব বলা যায় না; সুতরাং তাহা উপাদেয় বা আস্বাদ্য হয় না ।

"সর্ব্বানন্দচমৎকারহেতুর্ভাবো বরো রতিঃ ।
এতে হি তদ্বিনা ভাবান্ন চমৎকারিতাশ্রয়াঃ ॥"
(ঐ-২।৩।৭০)

অভ্যাসপরায়ণ, পিচ্ছিলান্তঃকরণ ব্যক্তিতে ভুক্তি-মুক্তি-কামিগণের মধ্যে নাম-কীর্তন-শ্রবণাদিকালে এসব অশ্রু, পুলকাদি ভাব সচরাচর দৃষ্ট হয়ে থাকে, বস্তুতঃ তাকে সাত্ত্বিকভাব বলা যায় না, তা' সাত্ত্বিকাভাস এবং তার কোন আস্বাদন-

Scanned with CamScanner

চমৎকারিতা নেই। শ্রীল গোস্বামিপাদ লিখেছেন — সুতরাং এসব সাত্ত্বিকভাব জাতরতি সাধকের সাধারণ বা বাহ্যলক্ষণ; এছাড়া তাঁর নয়টি অসাধারণ বা আন্তর লক্ষণ রয়েছে। ঐ লক্ষণগুলো চিত্ত-মনে প্রকাশিত হলেই রতির আবির্ভাব অনুমিত হয়ে থাকে।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥"
(ঐ-১।৩।২৫-২৬)

অর্থাৎ 'ভাব বা রতির অঙ্কুরমাত্র যাঁদের জাত হয়েছে, তাঁদের নিম্নোক্ত অনুভাবগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে। (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) **নামগানে সদারুচি,** (৮) ভগবদগুণানুবাদে আসক্তি এবং (৯) তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি ।'

ক্ষান্তি — 'ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।" (ভঃ রঃ সিঃ-১।৩।২৭)। ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও অক্ষোভতা। ভক্তের পুত্রশোক হয়েছে বা দেহনাশের কারণ উপস্থিত হয়েছে; এতে ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু রতিমান্ ভক্ত দেহ-দৈহিকাদির নশ্বরত্বজ্ঞানে এবং সবই ভগবদিচ্ছা বোধে শ্রীহরি-স্মরণপূর্বক ধৈর্য-ধারণ করে থাকেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

"তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা, গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥"
(ভাঃ-১।১৯।১৫)

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত বল্লেন — 'হে বিপ্রগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমায় সম্প্রতি ঈশ্বরে অর্পিতচিত্ত বা শরণাগত বলে জানুন, ব্রাহ্মণকুমার প্রেরিত কুহক বা তক্ষক এসে আমায় যথেষ্ট দংশন করুক, তাতে ক্ষতি নেই; আপনারা শ্রীহরিগাথা গান করুন।' "এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। প্রাকৃত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥" (চৈঃ চঃ)।

অব্যর্থকালত্ব — জাতরতি ভক্ত সব সময় ভজন-সাধন নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি-ব্যতীত প্রাকৃত প্রসঙ্গে ভক্তের এক মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না। "কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল গোস্বামিপাদ হরিভক্তিসুধোদয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন —

"বাগ্ভিঃ স্তবন্তো মনসা স্মরন্ত-স্ত্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমস্ত-মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥"
(১২।৩৭)

"ভক্তগণ নিরন্তর বাক্যে শ্রীহরির স্তব, মনে স্মরণ এবং দেহে প্রণাম করেও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না; তাঁরা অশ্রু-বিসর্জন করতে করতে সমগ্র আয়ুষ্কাল শ্রীহরিচরণে সমর্পণ করে থাকেন।"

বিরক্তি — বিরক্তি অর্থে বিশ্বের জড়ীয়-রূপ-রসাদি বিষয়-গ্রহণে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অরোচকতা।

Scanned with CamScanner

"বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্ ।" (ভঃ রঃ সিঃ — ১।৩।৩০) । অমেধ্যাদি বিভৎস বস্তুর দর্শনে যেমন মানবের স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চিন্ময়-রূপ, গুণাদিতে প্রলুব্ধ বা আসক্ত ভক্তের জড়ীয় ভোগ্যবস্তুর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়ে থাকে । "ভুক্তি মুক্তি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ।" (চৈঃ চঃ)।

"যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ।।"

(ভাঃ-৫।১৪।৪৩)

"রাজর্ষি ভরত শ্রীহরিচরণে লুব্ধচিত্ত হয়ে যৌবনকালেই স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যজ বিষয়সকলকেও বিষ্ঠাবৎ হেয়জ্ঞানে অনায়াসে পরিত্যাগ করেছিলেন ।"

মানশূন্যতা — "উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মান-শূন্যতা" (ভঃরঃসিঃ-১।৩।৩২)। উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও যে অভিমান-হীনতা তাকেই মানশূন্যতা বলা হয় । "সর্ব্বোত্তম-আপনাকে হীন করি মানে ।" (চৈঃ চঃ)।

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ।।"

(পদ্মপুরাণ)

"রাজা ভগীরথ নৃপেন্দ্র-শিরোমণি হয়েও শ্রীহরিতে অনুরক্ততা বহন-করত শত্রুগৃহেও ভিক্ষা করতেন এবং চণ্ডালকে পর্যন্ত বন্দনা করতেন ।"

Scanned with CamScanner

আশাবন্ধ — "আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া ।।" (ভঃ রঃ সিঃ-১।৩।৩৪)। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনাকেই আশাবন্ধ বলা হয় ।' "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রার্থনা —

"ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা ।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ।।"

"হে গোপীজনবল্লভ ! আমার প্রেম নেই, শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তিসাধনও নেই, বৈষ্ণবযোগ অর্থাৎ ধ্যান-ধারণাদি প্রভৃতিও নেই; ভগবন্নিষ্ঠ-জ্ঞান, শুভকর্ম বা বৈষ্ণব-পরিচর্যাদি অথবা পরিচর্যার উপযুক্ত সজ্জাতিও নেই । তবু দীনহীন-জনের প্রয়োজন-সাধনে তুমি সমধিক দয়ালু জেনে তোমার প্রাপ্তিবিষয়ে অচ্ছেদ্যমূলা আশাই আমাকে ব্যথা দিতেছে । অর্থাৎ কোনমতেই তোমার কৃপাপ্রাপ্তির আশা ছাড়তে পারছি না । হায় হায় ! এখন আমি কি করব ।" "আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ । তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ।।" (চৈঃ চঃ) ।

সমুৎকণ্ঠা — "সমুৎকণ্ঠা হয়-সদা লালসাপ্রধান ।" (চৈঃ চঃ)। স্বাভীষ্ট প্রাপ্তি-বিষয়ে গুরুতর লোভকেই সমুৎ-কণ্ঠা বলা হয় । "সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা ।।" (ভঃ রঃ সিঃ-১।৩।৩৬)।

Scanned with CamScanner

"তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবৈহি
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ।।"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৩২)

'হে নাথ ! তোমার কৈশোর-মাধুরী এবং আমার চাপল্য উভয়ই ত্রিভুবনে অদ্ভুত, এ কেবল তোমার এবং আমারই অধিগম্য; সুতরাং নয়নদ্বারা তোমার ঐ বিরল মুরলী-বিলাসী মনোহর মুখাম্বুজ-দর্শনের নিমিত্ত আমি কি করব তুমিই বলে দাও ।'

নামগানে সদারুচি — "নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ-নাম ।" (চৈঃ চঃ) । নিরন্তর নাম-কীর্তনের অভিলাষ জন্মে থাকে ।

"রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ !
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালাম্ ।।"

"হে গোবিন্দ ! অদ্য বালা রাধা নয়নকমল থেকে অশ্রু-বিন্দু ক্ষরণপূর্বক মধুরস্বরে তোমার নামাবলিই গান করছেন ।"

তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি — ভক্তের সর্বদা ভগবদ্‌গুণ-কথনে আসক্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে । "কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি ।" (চৈঃ চঃ) ।

Scanned with CamScanner

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ।।"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৯২)

ঠাকুর শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদে বিপুল আসক্তি প্রকাশ-পূর্বক বল্লেন — "অহো ! শ্রীকৃষ্ণের দেহ মধুরাদপি মধুর অর্থাৎ অতি সুমধুর, বদনখানি মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয় সুমধুর, মধুসৌরভ সমন্বিত তাঁর মৃদুমন্দ হাস্য মধুর মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অনন্ত সুমধুর ।।" শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যরূপ গুণ-বর্ণনার কোন ভাষা না পেয়ে যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মধুর মধুর শব্দগুলি আবৃত্তি করেছেন, এ তাঁর শ্রীকৃষ্ণগুণানুকথনে বিপুল আসক্তির পরিচায়ক ।

তদ্বসতিস্থলে প্রীতি — তাদৃশ জাতরতি সাধকের শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রীতিপ্রকাশ পেয়ে থাকে । "কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ।" (চৈঃ চঃ) ।

"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ?"

(ভঃ রঃ সিঃ-১।২।১৫৬)

"হে কমললোচন ! কবে আমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে যমুনাতীরে তাণ্ডবনৃত্য-রচনা করব ?" চিত্ত-মনে এ লক্ষণগুলো অল্পবিস্তর উদিত হয়ে বাহ্যে নাম-কীর্তনে যদি অশ্রুপুলকাদি বিকার প্রকাশ

Scanned with CamScanner

পায়, তবেই তাকে যথার্থ সাত্ত্বিকভাব বলা হবে এবং তখনি নামমাধুরী আস্বাদনের চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাবে ।

ভক্ত আর্তি বা ব্যাকুলতার সহিত নাম-কীর্তন করলে শ্রীনামের কৃপায় অচিরায় তাদৃশ ভাবদশা প্রাপ্ত হয়ে ধন্য বা কৃতার্থ হয়ে থাকেন । শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"নাম্নান্ত সংকীর্ত্তনমার্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্ । রাত্রৌ বিয়োগাৎ স্বপতে রথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ।।"

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২।৩।১৬৭)

অর্থাৎ "সারা নিদাঘজোড়া পিপাসা কণ্ঠে বহন করে যে চাতকপক্ষিগুলো বর্ষাকালীন মেঘের প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে, বর্ষাকালে মেঘের অনুদয়ে তারা যেন বিপুল আর্তনাদের সহিত আকাশের পানে ধাবিত হয়, রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী এবং কুররী পক্ষিসমূহ যেন করুণকণ্ঠে বিলাপ করে থাকে, তদ্রূপ অনুরাগী ভক্তগণও কৃষ্ণবিরহে কাতর-প্রাণে "হরেকৃষ্ণেতি" আহ্বানাত্মক নাম-কীর্তন করবেন ।" অবশ্য বিরহব্যাকুলপ্রাণে এপ্রকার আর্তিযুক্ত নাম-কীর্তন রতি বা প্রেমের উদয়েই সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবু সাধকগণকেও এভাবে নাম-কীর্তনের প্রযত্ন বা অভ্যাস করতে হবে; কারণ সিদ্ধের যা' লক্ষণ, সাধকের তাই সাধনা । "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ ।" সাধকের সাধন-প্রযত্নটি হচ্ছে — নিরপরাধে নামানুশীলন । নিরপরাধচিত্তে নাম-কীর্তনে সত্বরই

Scanned with CamScanner

নাম-প্রেমের বা ঐসব সাত্ত্বিকভাবের সমুদয় অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে **অশ্রুধার ॥**
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ)

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে যে অপরাধের বিচার নেই, তা' নয়। নাম-ভজনে প্রেমপ্রাপ্তির পথে অপরাধের বিচার সর্বত্র। মহাপ্রভু স্বীয় জননী শচীদেবীরই অদ্বৈতচরণে অপরাধ প্রেম-প্রাপ্তির বাধক বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে প্রকট-লীলায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিশ্বের আপামরে প্রেমদানের সঙ্কল্পহেতু এমন

Scanned with CamScanner

ব্যাপক করুণা-প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁদের দর্শনেই অপরাধীর অপরাধ বিদুরিত হয়ে প্রেমপ্রাপ্তি সুলভ হয়েছিল। এটি প্রকট-কালের কথাই শ্রীল কবিরাজ বলেছেন। তবে প্রেমাবতার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-কীর্তনে এবং স্মরণ-মননে সেই উজ্জ্বল আদর্শের স্মৃতিতে অপরাধের লাঘবতা এবং প্রীতির সহিত নাম-কীর্তনে সৌভাগ্য লাভ যে ত্বরান্বিত হয়ে থাকে এতে আর কিছু সন্দেহ নেই। বিষয়টিকে আমরা আর একটু খুলে বলি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে মহাবিরহসিন্ধুতে অহর্নিশি নিমজ্জমান হয়েও বা সাক্ষাৎ বিরহরসের মূর্তি হয়েও প্রেমের অতৃপ্তি-স্বভাব-বশতঃ এবং জীবশিক্ষার নিমিত্ত অশ্রু-পুলকাদি ভূষিত দেহে আর্তিভরে নামকীর্তনের কামনা করছেন। বিশ্ব-মানব কোন বিষয়ে যে সৎশিক্ষা পায়, তার পিছনে একটি আদর্শ থাকা চাই। এ বিশেষ কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাদৃশ নামকীর্তনের মূর্ত আদর্শ। শিক্ষার দ্বারা মানুষ জ্ঞানলাভ করতে পারে, কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ে কোন উচ্চ আদর্শ নয়ন-সম্মুখে দেখতে পেলে তারা প্রত্যক্ষানুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ করে সে শিক্ষায় সহজেই অনুপ্রাণিত হতে পারে।

যেমন একস্থানে কোন যুবক এক যোগীগুরুর নিকট ধ্যান-শিক্ষা করত। যুবকটি একজন ফল-বিক্রেতা। সারাদিন ফল বিক্রয় করে সে সন্ধ্যার সময় যখন যোগীর উপদিষ্ট বিতস্তি-পরিমাণ পরমাত্ম-পুরুষের হৃদয়ে ধ্যান করত, তখন

Scanned with CamScanner

আপেল, কলা, লেবু, আঙুরাদি ফলের চিত্রগুলো তার ধ্যান-স্তিমিত নয়ন-সম্মুখে ভাসত। কেননা বিষয়ীমানুষের চিত্তটি জতু বা গালার মত কঠিন, নীরস ও মিষ্টতাশূন্য। জতু বা গালা যেমন কঠিন হলেও অগ্নির সন্নিকর্ষে নরম হয়ে যায় এবং তখন তা'তে মোহর-ছাপ দিলে যেমন সেটি গালায় লেগে থাকে, গালাটি কঠিন হলেও ছাপটি যায় না; তদ্রূপ বিষয়ীমানবের চিত্ত বিষয়ের সন্নিকর্ষে যখন গলিত হয়, তখন তা'তে বিষয়ের ছাপ লেগে যায়; বিষয়ের সন্নিকর্ষ গেলেও ছাপটি যায় না, নয়ন-সম্মুখে তাই খেলে বেড়ায়।

যুবকটি নিজের মনের অবস্থা যোগীর নিকট জ্ঞাপন করলে তিনি বল্লেন — সে যেন তার ধ্যানের ঘরে কতকগুলো কলা, আপেলাদি ফল ঝুলিয়ে রাখে। যখন চোখ বুজে ধ্যানের সময় তার সম্মুখে ফলের চিত্র ভেসে উঠবে, তখন যেন সে চোখ খুলে ঐ ফলগুলোকেই দেখে এবং ঐ গুলোকেই ভাবতে থাকে। তবে প্রথম দিন যে ফল সে ঝুলিয়ে রাখবে, ঐগুলোই যেন থাকে, ওগুলোকে যেন সে না পাল্টায়। দেখতে দেখতে কয়দিন পরে ঐ ফলগুলো পচে নষ্ট হতে লাগল। গুরুর আদেশে পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ও বীভৎস ফলগুলোকেই যুবকটি দেখে ও চিন্তা করে। শেষে ওগুলো গলে পচে সব নষ্ট হয়ে গেলে সে স্থানটি পরিষ্কার করে শ্রীগুরুদেবের নিকট জানাল যে; ওগুলো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, এবার অন্য ফল না ঝুলালে আর উপায় নেই।

Scanned with CamScanner

গুরুদেব বল্লেন, — আর কোন ফল ঝুলাবার দরকার নেই। যেদিন থেকে ফলগুলো তার পচা, দুর্গন্ধযুক্ত স্বরূপ তার কাছে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে তার মন আর ঐ ফলের চিন্তন করতে রাজী হয় নি। সে এরপর এটি সহজেই বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার ইষ্টের ধ্যানটি সুগম হবে।

যোগী যদি যুবকটিকে বলে দিতেন যে, ফলের পরিণাম অতি বীভৎস বা ঘৃণ্য সুতরাং সেগুলির চিন্তায় কোনো লাভ নেই, তা' হলে সেটি হত **জ্ঞান**; কিন্তু তিনি যে প্রক্রিয়াটিতে ফলের সেই বীভৎস রূপটি তার চক্ষু-নাসিকাদি প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়ে দিলেন; এটির নাম হল **বিজ্ঞান** বা অনুভব।

তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যে, অশ্রু-পুলকাদির সহিত বা প্রীতির সহিত নামকীর্তনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা' নামসংকীর্তন-বিষয়ক **জ্ঞান**, আর মহাপ্রভু স্বয়ং পার্ষদগণসহ বিপুল অনুরাগভরে ও অদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকারের সহিত নাম-সংকীর্তন করে বিশ্বসাধকগণের সম্মুখে যে মূর্ত আদর্শ প্রকাশিত কল্লেন, তা' হল সানুরাগে নামসংকীর্তনের **বিজ্ঞান**। প্রভু শ্রীনামকীর্তন করতে করতে চঞ্চল-চরণে নৃত্য করে পথে পথে চলেছেন, শ্রীনয়নের প্রবল অশ্রু-প্রবাহে শ্রীঅঙ্গ বিধৌত হয়ে ধরাতল সিক্ত হচ্ছে; শ্রীঅঙ্গে কদম্ব-কেশরের ন্যায় সঘন পুলক-রাশি, গদ্গদকণ্ঠে কৃষ্ণনামের এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে যেন কতই অমৃতাস্বাদ লাভ করছেন। আজানুলম্বিত বাহুদণ্ড

Scanned with CamScanner

ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে উচ্চকণ্ঠে "হরি হরি" বলছেন। চারদিকে পার্ষদবৃন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে ঘিরে শ্রীখোল-করতাল-সহযোগে মধুকণ্ঠে নামগান করতে করতে চলেছেন। সবার অঙ্গ বিপুল অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকারে বিভূষিত। নামসংকীর্তনরসটি যেন মূর্তিমান্ !! এই ভাবচিত্র সাক্ষাৎ-দর্শনের কথা দূরে থাক —এর স্মরণে মননেও মানুষের চিত্ত যে নামরসে ভাবকুল হয়ে পড়বে, এতে আর বিচিত্রতা কি আছে। মহাজন শ্রীগৌরের সেই সুমধুর কীর্তনরসের কি চমৎকার আলেখ্য রচনা করেছেন—

"মধুর মধুর গৌরকিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট ॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত গাওয়ে মধুর গান ॥
মধুর হেলন মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর মধুর মধুর ভাতি ॥
মধুর অধর জিনি শশধর মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরিতি মধুর মধুর ভাষ ॥
মধুর যুগল নয়ন রাতুল মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদরে বঞ্চিত শেখর রায় ॥"

অদ্ভুত সংকীর্তনপ্রেমের এই সুধা-মধুর রস-কাদম্বিনী বিশ্বসাধকগণের অন্তরকে নামরসে নিত্যই সিক্ত করছে এবং অনন্তকাল ধরে করবে। তাই মহাজন বল্লেন —

Scanned with CamScanner

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥

গোবিন্দ-বিরহে নিমিষকাল আমার যুগের মত মনে হচ্ছে ; নয়নদ্বয় বর্ষার ধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করছে এবং সারা বিশ্ব শূন্য বলে বোধ হচ্ছে । সাধকদশার থেকে প্রভুর সহসা মহভাবদশার এশ্লোকটি পাঠ করার হেতু নিরূপণ করলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ —

"রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলাপন ॥" (চৈঃ চঃ)

"শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণাঃ হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্ণি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়া ॥"

প্রভু আলোচ্য ষষ্ঠ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-মাধুরী স্বয়ং আস্বাদন করলেন —

"প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥" (চৈঃ চঃ)

প্রেমব্যতীত সাত্ত্বিক-বিকার-বিভূষিত দেহে উক্ত প্রকার নামকীর্তন সম্ভবপর নয় বলেই প্রভু প্রেমসিন্ধু হয়েও প্রেমের অতৃপ্তি-স্বভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমধন চাইলেন । প্রেমই জীবের প্রকৃত সম্পদ্, প্রেমব্যতীত সবই নিষ্ফল, অতএব প্রত্যেক জীবেরই প্রেমধন অর্জনের নিমিত্তই প্রয়াস করা উচিৎ — প্রভুর এই শ্রীমুখোক্তির ইহাই সারশিক্ষা । ॥৬॥

Scanned with CamScanner

প্রেমের কথা বলতেই প্রভুর সাধকভাব অন্তর্হিত হল, তিনি স্বাভাবিক নীলাচল-লীলায় স্থায়ি-বিরহবিধুরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হলেন। বিরহভাবের স্ফুরণ হওয়ায় প্রভুর হৃদয়স্থ মহাভাবসিন্ধু উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যাদি, সঞ্চারী প্রভৃতি ভাবতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। প্রভু অমনি এই সপ্তম শ্লোকটি পাঠ করে প্রলাপ করতে লাগলেন।

ব্রজপ্রেমে, বিশেষতঃ গোপীপ্রেমে সর্বাধিক শ্রীকৃষ্ণবিরহ। বিরহের প্রাচুর্যই গোপীপ্রেমের মহত্ত্বের একটি অন্যতম কারণ। প্রেমেরই দু'টি কলেবর — একটি মিলন অপরটি বিরহ। প্রেমই যখন বিরহের উপাদান, তখন মিলনের ন্যায় বিরহেও যে আনন্দ বা রসের আস্বাদন নিহিত থাকবে, একথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বিরহকেও 'রস' বলা হয়েছে এবং শ্রীল গোস্বামিপাদগণ মিলনানন্দ-অপেক্ষাও এই বিরহরসের উপাদেয়তা বা আস্বাদন-চমৎকারিতা প্রতিপাদন করেছেন।

'প্রাগ্যদ্যপি প্রেমকৃতাৎ প্রিয়াণাং,
বিচ্ছেদদাবানলবেগতোহন্তঃ।
সন্তাপজাতেন দুরন্তশোকা-
বেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্ ॥
তথাপি সম্ভোগসুখাদপি স্তুতঃ,
স কোঽপ্যনির্বাচ্যতমো মনোরমঃ।
প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবং,
তত্র স্ফুরেত্তদ্রসিকৈকবেদ্যঃ ॥

Scanned with CamScanner

তচ্ছোকদুঃখোপরমস্য পশ্চা,-
চ্চিত্তং যতঃ পূর্ণতয়া প্রসন্নম্ ।
সম্প্রাপ্তসম্ভোগমহাসুখেন,
সম্পন্নবত্তিষ্ঠতি সর্ব্বদৈব ॥
ইচ্ছেৎ পুনস্তাদৃশমেব ভাবং,
ক্লিষ্টং কথঞ্চিৎ তদভাবতঃ স্যাৎ ।
যেষাং ন ভাতীতিমতেঽপি তেষাং,
গাঢ়োপকারী স্মৃতিদঃ প্রিয়াণাম্ ॥"

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্-১।৭।১২৫-১২৮)

শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে বল্লেন — "হে দেবর্ষে ! প্রিয়জনের স্মৃতিতে যদিও বিরহ প্রথমতঃ দাবানল থেকেও অন্তরে তীব্র জ্বালা বা সন্তাপ জন্মায় এবং তা' থেকে অসীম দুঃখ এবং শোকের প্রাদুর্ভাব হয়; তথাপি সে দুঃখ পরিণামে পরম সুখ-স্বরূপ বলে অন্তরে মিলনানন্দ-অপেক্ষাও প্রশংসনীয় কোন এক অনির্বচনীয় প্রমোদরাশির স্ফূর্তি জাগিয়ে দেয় । অর্থাৎ ঐ দুঃখ প্রেম থেকে সঞ্জাত বলে বিরহজনিত গাঢ় দুঃখের পরিপাক-দশাতেও প্রমোদরাশির উদয় হয় — এটি একমাত্র তাদৃশ রসিক-জনবেদ্য । বিরহজনিত শোক-দুঃখ উপরমের পর চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়ে মিলনানন্দ-সম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করতে থাকে । এরূপ অভীষ্টবস্তুর নিরন্তর স্ফূর্তি-হেতু অন্তঃকরণ সর্বদা পুর্ণতায় প্রসন্ন হয় । এ নিমিত্ত বিরহ-বিধুর-চিত্ত মহা-শোকার্ত রোদনাদিরূপ ভাবের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করে থাকে এবং

Scanned with CamScanner

বিরহ-জন্য শোকাদি আর্ত্তিভাবের অভাব ঘটলে চিত্তে অতিশয় দুঃখের উদয়ও হয়ে থাকে । যাঁদের মতে বিরহ-দুঃখ রুচিকর হয় না, প্রিয়জনের প্রগাঢ় স্মৃতি দান করে বলে তাঁরাও বিরহকে পরমোপকারী বলেই মনে করে থাকেন ।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ মিলনানন্দ-অপেক্ষাও স্তবনীয় কৃষ্ণ-বিরহজনিত আনন্দকে "কোঽপ্যনির্ব্বাচ্যতমো" বলে টীকায় এবিষয়ে স্বয়ং সিদ্ধান্ত করেছেন — "ব্রহ্মানন্দোঽনির্ব্বাচ্য-স্তস্মাদপ্যধিক্যেন ভজনানন্দোঽনির্ব্বাচ্যতরঃ, তত্র চ প্রেমানন্দো-ঽনির্ব্বাচ্যতমঃ, তত্রাপি বিরহার্ত্তিদ্বারা জাতঃ সন্ পরমান্ত্য-কাষ্ঠাবিশেষপ্রাপ্ত্যা পরমমহানির্ব্বাচ্যতম ইত্যর্থঃ ।" অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে শ্রুতি অনির্বাচ্য বলে উল্লেখ করেছেন — 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ সুতরাং ব্রহ্মানন্দ অনির্বাচ্য, ভজনা-নন্দ ব্রহ্মানন্দীর চিত্তকেও আকর্ষণ করে থাকে তাই তা' অনির্বাচ্যতর, ভজনানন্দই সান্দ্র বা গাঢ় হয়ে প্রেমানন্দ হয়, তাই প্রেমানন্দ অনির্বাচ্যতম; সেই প্রেমানন্দ আবার বিরহার্তির সহযোগে চরমসীমা প্রাপ্ত হয় হলে বিরহজনিত প্রেমানন্দকে পরম মহা-অনির্বাচ্যতম বলা হবে ।'

বিরহজনিত আর্তি বা জ্বালা বাইরে দুঃখের ন্যায় প্রতীয়-মান হলেও স্বরূপতঃ যে উহা সুখ বা আনন্দের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, শ্রীল গোস্বামিপাদ টীকায় দৃষ্টান্তের সঙ্গে এরও যুক্তি দেখিয়েছেন — "যথাগ্নি-প্রতিযোগি-ঘনহিমাদিস্পর্শেন পাদাদ্যঙ্গেষু জায়-মান-পরম-মহাজাড্যস্য জ্বলদঙ্গারস্পর্শবদভিজ্ঞা স্যাৎ । তত্র হি

Scanned with CamScanner

যথাঙ্গারস্পর্শপ্রতীতির্মিথ্যা পরমমহাজাড্যমেব সত্যম্, তথাত্রাপি দুঃখস্য প্রতীতের্মিথ্যাত্বমেব সুখস্যৈব সত্যত্বং বিজ্ঞেয়ম্ ।" অর্থাৎ 'যেমন অগ্নি-প্রতিযোগী বরফখণ্ডের স্পর্শে হাতে পায়ে অতি শৈত্যবশতঃ অগ্নিস্পর্শের ন্যায় জ্বালা অনুভূত হয়, কিন্তু সেখানে অগ্নিস্পর্শ সম্পূর্ণই মিথ্যা, তার সম্পূর্ণ প্রতিযোগী মহাশৈত্যের স্পর্শই সত্য । তেমনি ভগবদ্বিরহে যে দুঃখের প্রতীতি জাগে, তা' সম্পূর্ণই মিথ্যা; ঘনীভূত পরমানন্দই সত্য বলে জানতে হবে।' তাই ঘনীভূত আনন্দই ভগবদ্বিরহজনিত দুঃখের যথার্থ স্বরূপ । তাই মহাজন বলেছেন —

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ।।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ-মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে, কেননা মিলনে একাকী কৃষ্ণকে পাওয়া যায়; বিরহে ত্রিভুবন কৃষ্ণময় হয়ে থাকেন । জগতে মানুষের সহিত মানুষের যে বিয়োগ তা' কেবলই দুঃখময়, কেবল কৃষ্ণ-বিরহই পরমানন্দস্বরূপ । 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদায় যে কি আনন্দ, তা' যিনি কখনো কৃষ্ণ বলে কাঁদেন নি তিনি কি করে বুঝবেন ? "এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, যেন বিষামৃতে একত্র মিলন । বহির্বিষ-জ্বালা হয়, অন্তর আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ।।" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)

নীলাচল লীলায় মহাপ্রভুর শ্রীরাধার বিরহ রসই স্থায়ি-ভাব । হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করে গম্ভীরায় প্রভুর যে যাতনার

Scanned with CamScanner

উৎস উৎসারিত হত, মর্মীজন স্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায়ের কণ্ঠধরে বিলাপ করতে করতে প্রভু সে যাতনা কিঞ্চিৎ উদঘাটিত করতেন। এভাবে কেটে যেত কত দিন কত রাত। রাধাভাবে সখীজ্ঞানে তাঁদের কণ্ঠধরে বলতেন — 'সখি! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ আমায় উপেক্ষা করে কোথায় গেলেন? সখি! আমার এ কি হলো, কৃষ্ণবিরহে যে চারদিক্ অন্ধকার দেখছি। আমার একটি ক্ষণ শত শত যুগের মতো সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে — সখিরে! কি করে এ দুর্বিসহ জ্বালাময় কাল কাটাবো বলে দে।' কোন সময় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে চেয়ে বলতেন —

"তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এই রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটানো।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥" (চৈঃ চঃ)

এশ্লোকে প্রভু বলছেন — **"যুগায়িতং নিমেষেণ'** গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ আমার যুগের মত মনে হচ্ছে। ক্ষণকল্পতা নিমেষাসহতা প্রভৃতি মহাভাবেরই লক্ষণ। রূঢ়-মহাভাবের লক্ষণে দেখা যায় —

"নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নং।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া ॥
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ ॥"
(উজ্জ্বলনীলমনিঃ-১১৬)

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ "এই মহাভাবে নিমেষের অসহিষ্ণুতা, আসন্ন জনগণের হৃদয়-বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্তি-শঙ্কায় ক্ষীণতা, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ববিস্মরণ ও ক্ষণকল্পতা প্রভৃতি অনুভাব যথাযথ যোগে ও বিয়োগে দৃষ্ট হয়ে থাকে।" অধিরূঢ়ভাবে এগুলো আরও সমধিক প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রভু শ্রীরাধার অধিরূঢ় মহাভাবের চরমাবস্থা দিব্যোন্মাদের রসমাধুরী নীলাচললীলায় আস্বাদন করেছেন। সুতরাং বিরহা-বস্থায় মহাভাবের সব লক্ষণগুলি তাঁতে সর্বাধিক প্রকর্ষ প্রাপ্ত।

'দুঃখের সময় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলে মনে হয়, এ বিষয় জগতেও যৎকিঞ্চিৎ অনুভব হয়ে থাকে। দেহে ভীষণ পীড়া-দায়ক কোন ব্যাধি হলে সেই দুঃখভোগের রাত্রিটি যে সুদীর্ঘ বলে মনে হয়; কিছুতেই যেন সে রাত্রি কাটতে চায় না। তাই কথায় বলে দুঃখের কাল দুরতিক্রমণীয়। মহাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজ্বালা এতই অপরিসীম যে, একটা অতি ক্ষুদ্র নিমেষকালও যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ বলে মনে হয়। বিশ্বের সুখ-দুঃখের অনুভূতি এই কৃষ্ণমিলনও বিরহজনিত অপরিসীম সুখ-দুঃখের কোন ধারণাই দিতে পারে না। কৃষ্ণবিরহজ্বালার নিকট কোটি কোটি দাবানল, বাড়বানল, মহাকালকূটের তীব্রজ্বালা — সবই অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

'উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।

Scanned with CamScanner

তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥"
(ললিতমাধবনাটক-৩।২৮)

শ্রীরাধারাণী ললিতাকে বলছেন — 'সখি ! গোকুলপতির বিচ্ছেদজনিত জ্বর পুটপাক (যে পাত্রে ধাতু গলিত হয়) থেকেও অধিকতর উত্তাপদায়ী, গরলসমূহ হতেও অধিকতর ক্ষোভজনক, বজ্র থেকেও অতি দুঃসহতর, হৃদয়বিদ্ধ শেল-অপেক্ষাও কষ্ট-দায়ক এবং তীব্র বিসূচিকা রোগ-অপেক্ষাও তীব্রতর। সখি ! এই বিচ্ছেদজ্বরে আমার মর্ম ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।' সেই মহাজ্বালাময়ী দশা প্রেমিকের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষণগুলোকেও এতই অসহনীয় বেদনাময় করে তোলে যে, তাঁর একটি ক্ষুদ্রতম নিমেষকালও যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ বলে মনে হয়।

"তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা, ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং, হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥"
(ভাঃ-১১।১২।১১)

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন — 'হে উদ্ধব ! গোপীগণের প্রিয়তম আমি যখন ব্রজে ছিলাম, তখন আমার সঙ্গে তাদের যেসব রাত্রি ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হয়েছিল, আমা-বিহনে তাদের সেই রাত্রি কল্পের ন্যায় সুদীর্ঘ প্রতীত হচ্ছে।" আবার প্রভু বল্লেন— **'চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্'** 'গোবিন্দবিরহে আমার নয়নদ্বয় শ্রাবণের ধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করছে।' শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাদৃশ প্রেমিকের নয়নে যেন বর্ষার মেঘ জমে ওঠে।

Scanned with CamScanner

নিরন্তর অশ্রুজলই তাঁর সঙ্গী হয়। হৃদয়-তটিনীতে যে বিরহের শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, নিরন্তর রোদন, অশ্রুজল ও বিলাপ-ব্যতীত তাঁর আত্মভার-মোচনের আর কোন উপায়ই থাকে না। নিরন্তর রোদন করেও — বর্ষার অবিরল ধারার ন্যায় নয়নাশ্রুতে ধরণীতল সিক্ত করেও সেই নিদারুণ বিরহ-বিলাপের সীমা-পরিসীমা পাওয়া যায় না। বিরহিণী সখীর কণ্ঠধরে বলেন —

"শুনলহুঁ" মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলুঁ নয় পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি।
শূনহিঁ মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি ॥
দেখ সখি নিলজ জীবন শেয়।
পিরিতি জানায়ত অব ঘন রোয় ॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ-কুটির।
সো যমুনা জল মলয়-সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু-বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এতদিনে জানলুঁ বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আশ কি পাশ।
সম্বাদি না আয়ত গোবিন্দদাস ॥"

Scanned with CamScanner

বর্ষার আকাশের মেঘ প্রচুর জলধারা বর্ষণ করে নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আকাশে আবার জলপূর্ণ নবীন মেঘের উদয় হয়, এভাবে অবিরল জলধারা নিরন্তর বর্ষিত হতেই থাকে। তেমনি কৃষ্ণবিরহিণী গোপিকার রোদনের নিমিত্তও আক্ষেপ জাগে, আবার ব্রজের নৈসর্গীক শোভা পূর্বমিলনের মধুস্মৃতি অন্তরে জাগিয়ে দিয়ে প্রাণকে দুর্বিষহ বেদনাময় করে তোলে। দেহত্যাগের সঙ্কল্পও নিষ্ফল হয়; কারণ পুনরায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তির এবং কৃষ্ণসেবার দুরন্ত আশাকে কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। আবার হৃদয়াকাশে জমে ওঠে বিরহের নবীন মেঘ। আবার অবিরল বর্ষণ চলে নয়নদ্বারে। এভাবে অশ্রুজলই বিরহীর জীবনের একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে! সেই গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাবই প্রভুর অবিরল অশ্রুধারার মূল উৎস!!

প্রভু আরও বল্লেন — "**শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে'** 'গোবিন্দ-বিরহে সারা বিশ্ব যেন আমার শূন্যবোধ হচ্ছে।' এই শূন্যতা

"যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো,
হরিঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলীভিঃ ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত ! চেতস্ততো মে,
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গীকরোতি ।।"

(ললিত মাধবনাটক-৭ ।২৬)

নববৃন্দাবনে শ্রীরাধা বকুলার প্রতি বল্লেন — 'সখি ! যাঁর কেশকলাপে শিখিপিচ্ছ-নির্মিত মুকুট শোভা পাচ্ছে, পুষ্ট-গুঞ্জাবলি-রচিত হার যাঁর কণ্ঠে দুলছে, যাঁর শ্রীমুখে বেণু শোভা-বিস্তার করছে — শ্রীহরির এপ্রকার রূপভিন্ন অন্য কোন রূপ অলৌকিক হলেও আমার চিত্ত তা' অঙ্গীকার করে না ।"

"গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় —।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনা অন্যত্র না হয় ।।
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ।।
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার ।
গোপীভাব নাহি যায় নিকটে তাহার ।।"

(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিঃ)

গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাবে কৃষ্ণবিরহে মহাপ্রভুর বিশ্বশূন্য । বিরহিণী শ্রীরাধার চিত্তের শূন্যতার আলেখ্য রচনা করেছেন — শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর —

"অব মথুরাপুর মাধব গেল ।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ।।

Scanned with CamScanner

গোকুলে উছলল করুণাক রোল ।
নয়নক জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী ।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী ॥
কৈসনে যাওব যমুনা-তীর ।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥
সহচরী সঞে করল ফুলবারি ।
কৈসে জীয়ব হম তাঁহি নিহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে — কর অবধান ।
কৌতুকে ছাপি' তহিঁ রহু কান ॥" (পদকল্পতরু)

মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহে গৃহ, নগর, দশদিক্, এমন কি সারা বিশ্বই শূন্য মনে হয়। আবার বৃন্দাবনের সর্বত্র প্রতি বস্তুতে শ্রীহরির স্মৃতি জড়িত। যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলেই শ্রীহরির উদ্দীপনে সেই শূন্যতা আবার প্রবলাকার ধারণ করে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। তখন দেহ-ধারণ করাই যেন কঠিন হয়ে পড়ে। তবু কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত বেঁচে থাকতে হবে। মহারাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু শ্রীনন্দমহারাজ প্রাণত্যাগের কথা ভাবতেও পারলেন না। যতই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ হোক না কেন, তাঁকে যে বেঁচে থাকতেই হবে। কারণ তাঁর বিহনে তাঁর গোপাল পিতৃহীন হয়ে কত কষ্ট পাবে। ব্রজসুন্দরীগণের তো দেহটিই শ্রীকৃষ্ণসেবার অপূর্ব উপচার। সুতরাং তাঁদের বিহনে কৃষ্ণের

Scanned with CamScanner

যে কি কষ্ট তা' তো ভাবাই যায় না — হয়ত তাঁদের বিরহে তিনিও দেহধারণ করতে সক্ষম হবেন না ।

"প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শুনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ।।" (চৈঃ চঃ)

কাজেই একদিকে যেমন নিদারুণ বিরহে প্রাণ-ধারণ করাও কঠিন, অপরদিকে মরবারও উপায় নেই অবিরত বিরহ-তুষানলে হৃদয় ধিকি ধিকি জ্বলে । এরূপ দুর্বিষহ দুঃখ-সঙ্কটেই প্রতিটি মুহূর্ত বিরহীর যুগের মত মনে হয়, নয়নদ্বয় বর্ষার মেঘের ন্যায় অবিরলধারায় অশ্রুধারা বর্ষণ করে এবং সারা বিশ্বই শূন্য বলে মনে হয় । বাইরে এপ্রকার বিষজ্বালার অনুভব হলেও অন্তরে প্রবল আনন্দের স্রোত বইতে থাকে, এ রহস্য একমাত্র তাঁদেরই বেদ্য । রাধার ভাবে প্রভু নিরন্তর এই অদ্ভুত আনন্দ-বেদনার সিন্ধুতে ভাসমান ।

"এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজভাব করেন বিদিত ।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত ।।
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন ।

Scanned with CamScanner

সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ)

"আপনে করি আস্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে" (চৈঃ চঃ)। প্রভু স্বয়ং এই ব্রজপ্রেমের বিরহরসাস্বাদন-করত তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণকেও বিরহের ভিতর দিয়ে ব্রজমাধুরী আস্বাদনের কৌশল শিক্ষা দিলেন । তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদি ষড়্গোস্বামিতেও অনুরূপ বিরহরসসাধনার আদর্শ পাওয়া গেল । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের উৎকলিকা-বল্লরি ও শ্রীপাদ রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি স্তবই তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিয়ে থাকে । শ্রীরূপ তাঁর উৎকলিকাবল্লরির প্রথমেই লিখেছেন —

"প্রপদ্য বৃন্দাবনমধ্যমেকঃ, ক্রোশন্নসাবুৎকলিকাকুলাত্মা ।
উদঘাটয়ামি জ্বলতঃ কঠোরাং, বাষ্পস্য মুদ্রাং হৃদি মুদ্রিতস্য ।।"

"হা নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হা দেবি শ্রীরাধিকে ! তোমাদের এই ব্রজধাম আশ্রয়-পূর্বক এ দীনজন তোমাদের দর্শন-লালসায় আর্তস্বরে রোদন করে তার বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে সংরুদ্ধ অতি কঠিন জ্বলন্ত বাষ্পরাশির মুদ্রা উদঘাটন করছে । তোমরা দেখ, তোমাদের বিরহে তোমাদের রূপের হৃদয়ে কত জ্বালা ।" এই নিদারুণ বিরহের কথা ভজনসম্পত্তিশূন্য জীবের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব । অভীষ্ট-দর্শনলালসার নব নব তরঙ্গ বিরহাকুল হৃদয়সিন্ধুকে উদ্বেলিত করে তুলছে । ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে!

Scanned with CamScanner

তাই শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং সেবা-লালসায় বিরহিণী সেবিকা কাতর ক্রন্দন করে হৃদয়নিহিত পুঞ্জীভূত বিরহ-বাষ্প উদঘাটন করে অভীষ্ট-চরণে জ্ঞাপন করছেন । শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এশ্লোকের টীকায় লিখেছেন — "ইয়মবস্থা খলু ভক্ত-জনস্য পুরুষার্থদাত্রী" এরূপ বিরহাকুল দশাটিই ভক্তের পরম-পুরুষার্থ । ভগবানকে লাভ করা-অপেক্ষাও এরূপ বিরহদশা লাভ করা ভক্তের শ্রেষ্ঠতর ভাবসম্পদ্ । শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণের শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-স্তবেও অনুরূপ বিরহবেদনা প্রকাশিত হয়েছে —

"অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন,
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-,
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ।।"

"হা স্বামিনি শ্রীরাধিকে । তোমার অতি দীনা দাসী আমি — তোমার অদর্শনজনিত অতি উৎকট-বিরহানলে দগ্ধীভূতা হয়ে উচ্চক্রন্দনদ্বারা সাতিশয় ব্যাকুলা হয়ে পড়েছি । শ্রীগোবর্ধন-প্রান্তে তোমারই কুণ্ডতটে বসে সব কর্ম হতে বিরত হয়ে প্রণয়ভরে পদ্যের দ্বারা বিলাপ করছি ।"

"দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে,
দুয়মানমতি-দুর্গতং জনম্ ।
ত্বং কৃপাপ্রবল-নৌকায়াদ্ভুতং,
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ।।"

Scanned with CamScanner

'হে দেবি ! লীলাময়ি ! দুঃখসমূহরূপ সিন্ধুর মধ্যে নিপতিত হয়ে এই দীনজন নিরাশ্রয় অবস্থায় অতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে । তুমি কৃপারূপ সুদৃঢ় নৌকায় চড়িয়ে একে তোমার পাদপঙ্কজরূপ আলয়ে নিয়ে যাও ।"

"ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনম্ ।
ত্বৎপাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দৈবি জীবয় ।।"

"হে দেবি ! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে মৃত এই জনকে তোমার পাদপদ্মের অলক্তকরূপ ঔষধদ্বারা জীবিত কর ।"

এই বিরহানলের দাবদাহ, এসুখের সাগর এত গম্ভীর এবং বিশাল, এই বিরহ-সর্পের দংশনজনিত কালকূটের জ্বালা এতই সুতীব্র এবং ভয়াবহ যে, সাধারণ জীবের ধারণারই অগোচর । শ্রীল গোস্বামিপাদগণের অলৌকিক ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূলেও নিহিত ছিল তাঁদের এই ইষ্টবিরহজনিত দুঃখ-বেদনারই প্রাবল্য। শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-সম্বন্ধে মহাজনের উক্তি —

"রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
শুখ রুখ অন্নমাত্র সার ।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার ।।
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জলপান ।

Scanned with CamScanner

রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ।।
শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে ।
কৃষ্ণ-কথা-আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ।।
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা-ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন ।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ।।
কান্দে গোঁসাই রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তনু-মনে
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর ।
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনার দেহ-ভার
বিরহে হইল জরজর ।।
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ।।
সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ ।
এ রাধাবল্লভ-দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে কর পরসাদ ।।”

Scanned with CamScanner

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের এই বিরহ-রসময় আদর্শ-চরিত্র থেকে ভক্ত-বৈষ্ণবগণের সার-শিক্ষা এই যে, ব্রজভাবের সাধনায় সাধকের মনে প্রাণে অল্প-বিস্তর ইষ্টের অভাববোধ জাগা দরকার। মাদৃশ জীবের চিত্তে নিত্য কত শত জড়ীয় ধন, জনাদির লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির অভাব জাগরিত হয়, কিন্তু ইষ্টের নিমিত্ত কোন অভাববোধ নেই। যে ব্রজধামকে আশ্রয় করে আচার্যপাদগণ এত বিষম বিরহসাগরে অহর্নিশি সন্তরণ করেছেন, সেই ব্রজধামে বসবাস করে মাদৃশ জীবের যথেচ্ছ আহার-নিদ্রার সুখভোগ, হাসি-খুশি, ফিটফাট, আমোদ-প্রমোদ সবই আছে এবং যন্ত্রের মতো নিয়ামানুবর্তিতায় শ্রবণ-কীর্তন-অর্চনাদি ভজনও চলছে। মাদৃশ সাধকের নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে লজ্জিত হওয়া উচিৎ। চিত্তে ধিক্কার, অনুতাপ জাগা উচিৎ। আচার্যপাদগণের পরম শক্তিশালী প্রার্থনার আবৃত্তির সহিত নিজচিত্তে ইষ্টের অভাব বা উৎকণ্ঠার সুরটি মিশিয়ে অনুরাগময় ভজনজীবন লাভের নিমিত্ত কাতর-প্রাণে প্রার্থনা করা উচিৎ —

"হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহু 'পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কাঁদিয়া ॥

Scanned with CamScanner

দেখিব সঙ্কেত-স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব ।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ।।
মাধবী-কুঞ্জের 'পরি, সুখে বসি শুকসারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণরস ।
তরুমূলে বসি তাহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস ।।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতনসিংহাসনে ।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এমতি হইবে কতদিনে ।।"

এই বিরহ-বিধুর প্রাণে উৎকণ্ঠাশীল সাধকের ব্রজবাসের মধুর চিত্র । আচার্যপাদগণের উৎকণ্ঠাময় প্রার্থনার অনুশীলন করলে সাধকের প্রার্থনাটি খাঁটি হবে এবং ক্রমশঃ তাঁদের চিত্ত-মনে ইষ্টের অভাববোধ অনুভূত হবে । মহাপ্রভু স্বয়ং শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করলেন —

"উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ।।
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ।।"

(চৈঃ চঃ) ।।৭।।

Scanned with CamScanner

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

শ্রীরাধা বল্লেন — হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদদাসী আমায় আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত বা আত্মসাৎই করুন, অথবা অদর্শনে আমায় মর্মাহতই করুন; বা সেই বহুবল্লভ তিনি যেখানে সেখানে যে কোন রমণীর সঙ্গে বিহারই করুন, যাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথ ভিন্ন অপর কেউ নন ।

বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে "যুগায়িতং নিমেষেণ" শ্লোকটি পাঠের পর প্রভুর মন ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্যাদি সঞ্চারিভাবে ব্যাকুল হল, তখন শ্রীরাধার ভাবে এশ্লোকে সখীর নিকট স্বীয় মনের কথা ব্যক্ত করলেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রভুর এশ্লোকটি পাঠ করার হেতু-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন —

"কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে — কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥
ঈর্ষ্যা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয় ।
এত ভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হইল ।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল ॥

Scanned with CamScanner

সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল ।।" (চৈঃ চঃ)

একদা শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে থাকেন । শ্রীরাধার নিকটে আসেন না, শ্রীরাধার সখীগণের নিকট শ্রীরাধার বিরহব্যথা শ্রবণে চিত্ত ব্যথিত হলেও বাহ্যে কোন কাতরতার ভাব প্রকাশ করেন না । এদিকে শ্রীমতী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহে সাতিশয় অধীরা হয়ে পড়েছেন । সখীগণ পরম অভিজ্ঞা । শ্রীকৃষ্ণ বাহ্যে শ্রীরাধার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করলেও এটি যে তাঁর অন্তরের ভাব নয়; মর্মী সখীগণ তা' সবই জানেন । তাই তাঁরা শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলছেন — 'রাধে ! তুমি প্রেমময়ী, তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা কখনই সম্ভবপর নয় । তুমি তাঁর জন্য ব্যাকুলতা-প্রকাশ করছ বলেই তিনি তোমার ব্যগ্রতা দেখার নিমিত্ত উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করছেন । তুমিও যদি ব্যগ্রতা-প্রকাশ না করে তাঁর প্রতি একটু ঔদাসীন্য দেখাও, তবে তিনি আর স্থির থাকতে পারবেন না; স্বয়ং তোমার নিকট আগমন করবেন ।' সখীগণের কথা শুনে শ্রীমতীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সুখভাবনাময় স্বাভাবিক প্রেমভাবের উদয় হল । স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ-সম্বন্ধে বর্ণিত আছে —

"স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতি ।

Scanned with CamScanner

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী ।
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ।।"
(বিদগ্ধমাধবনাটক-৫।৪)

"যা'তে প্রশংসা ঔদাসীন্য-প্রকাশ করছে বলে চিত্তে ব্যথা প্রদান করে (অর্থাৎ প্রিয়ব্যক্তি প্রশংসা করলে সেটি তার ঔদাসীন্য বলে মনে হয়, এজন্য দুঃখ জন্মে) যাতে নিন্দাও পরিহাসশ্রী পোষণ করে আনন্দ দেয় (অর্থাৎ প্রিয়জন নিন্দা করলে সেটি তার পরিহাস বলে মনে হয় এজন্য আনন্দ হয়) যা' কোন দোষ-দর্শনে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না এবং গুণ-দর্শনেও বৃদ্ধি পায় না, অনির্বচনীয় সহজ প্রেমের প্রক্রিয়া এভাবেই ক্রীড়া করতে থাকে ।"

এই স্বাভাবিক প্রেমভাবের উদয়ে সখীগণের কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীরাধার চিত্তে যুগপৎ ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি (উৎসাহ) বিনয়-প্রভৃতি সঞ্চারিভাবের উদয় হল । এই ভাবসংমর্দে শ্রীরাধার মন অস্থির হয়ে পড়ল । এ অবস্থায় সখী-গণের নিকট তিনি যা' বলেছিলেন **'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং'** শ্লোকে তাই বিবৃত হয়েছে । রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও মনে করছেন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সখীগণ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত অনুরূপ উপদেশ দিচ্ছে । রাধাভাবের স্ফুরণে প্রভুর চিত্তে ঐসব সঞ্চারিভাবগুলি যুগপৎ উদিত হল, প্রভু তখন শ্রীরাধার শ্রীমুখোচ্চারিত এশ্লোকটি পাঠ করলেন !

Scanned with CamScanner

আলোচ্য 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' প্রভুর এই শেষ শিক্ষা-শ্লোকটি অতিশয় ভাবগম্ভীর, এর তাৎপর্য বহু সুদূর প্রসারী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ স্বয়ং লিখেছেন — "এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে — তার নাহি পাই পার ॥" কোন কোন পুস্তকে এই পয়ারটি দেখা যায় না। তা'তে বুঝতে হবে প্রভু স্বয়ংই পরবর্তী ত্রিপদীগুলিতে শ্লোকের অর্থাস্বাদন করেছে। আর যেসব পুস্তকে এই পয়ারটি আছে, সেখানে বুঝতে হবে প্রভুর আস্বাদ্য ভাবটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদই প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, অর্থাৎ মহাপ্রভু স্বয়ংই ত্রিপদীগুলিতে শ্লোকটির অর্থাস্বাদন করুন, বা কবিরাজ গোস্বামিপাদই প্রভুর ভাবটি ব্যক্ত করুন; পূর্বশ্লোকগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-অপেক্ষা যখন এশ্লোকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তখন আমরা ঐ ত্রিপদীর ব্যাখ্যা করেই শ্লোকটির অর্থাস্বাদনের চেষ্টা করব। কিন্তু ত্রিপদীগুলির ব্যাখ্যা করার পূর্বেও ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থারতি বা মহাভাবের লক্ষণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করলে ত্রিপদীগুলির ব্যাখ্যাও হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন হবে।

শ্রীকৃষ্ণসুখানুকূল্য-তৎপরতাই প্রেমের জীবনীশক্তি। যে প্রেমে ঐ শ্রীকৃষ্ণসুখানুকূল্য-তাৎপর্যটি যত গরিষ্ঠ, যা'তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাধি আত্মসুখাকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখকামনায় লক্ষ্যটি কেন্দ্রীভূত হয়, সেই প্রেমই তত মহত্তর বলে বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ-সুখের দ্বারে আত্মসুখবাসনাকে

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে গোপিকাগণ যেমন জানেন, তেমনটি আর কেউই জানেন না । তাঁদের সমর্থারতি এতই সান্দ্রতম যে, যার গন্ধমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-ব্যতীত অন্য সবই বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যায় । "সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতাঃ ।" (উঃ নীঃ) । এই অতিসান্দ্র সমর্থারতির উদয়েই ব্রজসুন্দরীগণ দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন, কুলধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি সব ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য আত্মহারা হয়ে থাকেন ।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সম্ভোগেচ্ছা-(নায়ক-নায়িকা) পরস্পরের মিলনেচ্ছা) ভিন্ন মধুরারতি হয় না । সেই সম্ভোগেচ্ছা দ্বিবিধ — (১) প্রিয়জনদ্বারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-সুখেচ্ছাময় এবং (২) নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়সুখ-ভাবনাময় । এ দুয়ের মধ্যে পূর্ব সম্ভোগেচ্ছাটি নিজ সুখোন্মুখতাহেতু 'কাম' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় সম্ভোগেচ্ছাটি প্রিয়জন-সুখোন্মুখতাহেতু 'রতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । সমর্থারতিতে সম্ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়ে রতির সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশ পায় । তাই উহা শ্রীকৃষ্ণানুকূল্য-তাৎপর্য এবং শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা-স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে ।

"সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যাঃ রতের্জাতু ন ভিদ্যতে ।
ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ।।" (উঃ নীঃ-১৪।৫৫)

অর্থাৎ 'এই সমর্থারতি হতে সম্ভোগেচ্ছা কখনই স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয় না । এজন্য সমর্থারতিতে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই সকল উদ্যম প্রকাশ পেয়ে থাকে ।' এই সমর্থারতিই প্রৌঢ়া

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ বৃদ্ধিশীলা হয়ে মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয় । "ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ ।" (উঃ নীঃ) । এই মহাভাব একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণেরই ভাবসম্পদ্ । অন্য কান্তার কথা দূরে— রুক্মিণী, সত্যভামাদি মহিষীগণেও পর্যন্ত এ অতি দুর্লভ ।

"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ ।
ব্রজদেবৈকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ।।" (ঐ-১১১)

এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃততুল্য আস্বাদন-সম্পত্তি ধারণ-করত মনকে স্বস্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায় । "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ ।" (ঐ)। "মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েৎ মহা-ভাবাত্মকমেব মনঃ স্যাৎ, মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্থঃ । তেন ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাদ্ব্রজসুন্দরীণাং মন আদিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্ব্বে-রেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব ভবেৎ ।।" (আনন্দ-চন্দ্রিকা-টীকা) । অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের মনকে মহাভাব স্ব-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায় অর্থে তাঁদের মন মহাভাবাত্মক হয়, মহাভাবের থেকে মনের আর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। আবার চক্ষু-কর্ণাদি, ইন্দ্রিয়সমূহও মনোবৃত্তিরূপ, সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণের মন এবং দশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সবই মহাভাবরূপ, তাই তাঁদের সর্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টাই শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য কল্পিত হয় এবং তাঁদের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক বশ্যতাও যুক্তিসিদ্ধ হয়ে থাকে । শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই মহাভাবের কার্য । তাই

Scanned with CamScanner

ব্রজসুন্দরীগণের সর্বেন্দ্রিয়-মনোবৃত্তির শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন-ব্যতীত আর কোন লক্ষ্যই নেই ।

একদা দ্রোণাচার্য মহাশয় দুর্যোধনাদি ও অর্জুনাদি কুরু-পাণ্ডব-কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা-পরীক্ষার নিমিত্ত একটি বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট একটি পক্ষীর ডান-চক্ষুটি কুমারদের লক্ষ্য বলে তা'তে বাণবিদ্ধ করতে আদেশ করেন । কুমারগণের মধ্যে অন্য কেউই লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হয় নি । একমাত্র অর্জুন অনায়াসে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হলেন । তখন দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করলেন — 'বৎস ! তুমি অনায়াসে অন্যান্য কুমারগণের অসাধ্য এই লক্ষ্যভেদে কিরূপে সমর্থ হলে ?' তদুত্তরে অর্জুন বল্লেন — "গুরুদেব ! প্রথমতঃ আমি লক্ষ্যস্থির করতে করতে বৃক্ষসমূহের মধ্যে মাত্র ঐ একটি বৃক্ষকেই দেখলাম । তারপর ঐ বৃক্ষের অনেক শাখার মধ্যে যে শাখায় পাখীটি বসে আছে, সেই শাখাটিতেই লক্ষ্যস্থির হল, তখনও আমি শরক্ষেপ করি নি । তারপর লক্ষ্যস্থির করতে করতে একটি পাখী-ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না, তখনও বাণত্যাগ করিনি । আবার সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্যস্থির করতে করতে পাখীটির শুধুমাত্র দক্ষিণ-চক্ষুটিই লক্ষ্যস্থির হল । যখন আমার সামনে ঐ চক্ষুটি-ব্যতীত আর কিছুই থাকল না, তখনি আমি শরনিক্ষেপ করলাম । এরূপ সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্যস্থির ও একাগ্রতার নিমিত্তই আমি কৃতকার্য হয়েছি ।' তেমনি মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের অখণ্ড একাগ্রতা ও সমগ্র লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানেই কেন্দ্রীভূত ।

Scanned with CamScanner

"সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা — রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ।।" (চৈঃ চঃ)

"তদেবং পরমমধুরপ্রেমবৃত্তিময়ীষু তাস্বপি **তৎসারাংশোদ্রেকময়ী শ্রীরাধিকা**, তস্যামেব প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠায়া দর্শিতত্বাৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ-১৮৯ অনুঃ)। অর্থাৎ 'পরমমধুর প্রেমবৃত্তিময়ী গোপীগণ-মধ্যেও তার (পরমমধুর প্রেমবৃত্তির) সারাংশ-উদ্রেকময়ী রাধাতেই প্রেমের পরমকাষ্ঠা মাদনাখ্য-মহাভাব বিরাজিত। সুতরাং শ্রীরাধাতেই প্রেমোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বলে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে প্রতিপাদিত হয়েছে।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ মাদনাখ্যপ্রেমের লক্ষণ-বর্ণনায় বলেছেন —

"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ।।"

(উঃ নীঃ-১১৫)

"হ্লাদিনীর সার প্রেম সর্ববিধ ভাবোদগমে উল্লাসশীল হয়ে **'মাদন'** আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই মাদন পরাৎপর ভাব, অর্থাৎ নিখিলভাবসমূহের শ্রেষ্ঠ। একমাত্র শ্রীরাধারই ভাবসম্পদ্, অন্যত্র কুত্রাপি এর স্থিতি নেই।" শ্রীরাধামাধবের মিলনের ভূমিতেই এই মাদনভাবের প্রকাশ হয়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরালীলায় মাথুরবিরহকাতরা শ্রীরাধার মোহনাখ্যভাবের চরম অনুভাব দিব্যোন্মাদের রসাস্বাদন করেছেন। এই দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধারই ভাবসম্পদ্ এবং

Scanned with CamScanner

মাথুর-বিরহেই এটি প্রকাশ পেয়ে থাকে। তত্ত্বতঃ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত-মূরতিই শ্রীগৌরাঙ্গদেব; সুতরাং তাঁ'তে তো শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলন বিরাজিত, তাঁ'তে শ্রীরাধার মাথুর-বিরহের চরম অনুভাব এই দিব্যোন্মাদের উদয় কিরূপে সম্ভব হতে পারে ? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এর সমাধান এই যে, মাদনভাব সর্বভাবোদগমোল্লাসী বলে মাদনভাবের ভিত্তির উপরেই মহাপ্রভুর মোহনাখ্যভাবের আস্বাদন সম্ভবপর হয়েছে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে —

"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ।
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা॥" (উঃ নীঃ ১৬০)

অর্থাৎ "যোগে বা শ্রীরাধামাধবের মিলন-ভূমিতেই এই মাদনভাবের প্রকাশ হয়, যা'তে সহস্রপ্রকার নিত্যলীলার বিলাস বিরাজ করে।" এশ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় লিখিত আছে — "যদা তু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধং বিয়োগানুভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি।" অর্থাৎ "যখন স্বয়ং মাদনাখ্য স্থায়িভাবের উদয় হয়, তখন শ্রীরাধামাধবের চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগানুভবের মধ্যেই যুগপৎ বিবিধ বিয়োগানুভূতিও বিরাজ করে, এরূপ একটি প্রকাশে যুগপৎ বিরুদ্ধ প্রকাশদ্বয়ের ধর্মানুভবই মাদনভাবের বৈলক্ষণ্য।" সুতরাং মহাপ্রভুতে অখণ্ড মাদনরস সতত বিরাজ করলেও বিরহের চরমভাব দিব্যোন্মাদরস আস্বাদনের কোন অসামঞ্জস্য

Scanned with CamScanner

নেই। বিশেষতঃ মাদনভাবের ভিত্তিতে এই মোহনাখ্যভাবের আস্বাদন-কার্যটি শ্রীরাধারাণী-অপেক্ষাও মহাপ্রভুতে আস্বাদনের সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে জানতে হবে। যা' হোক, শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলোচ্য-শ্লোকের আস্বাদনী প্রকাশ করছেন —

"আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥"

শ্রীললিতা, বিশাখাদি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শনের কথা শ্রীরাধারাণীকে বল্লে শ্রীরাধারাণী বল্লেন — 'সখি! আমি যে **কৃষ্ণপদদাসী**।' 'পদ' শব্দটি দৈন্যভরেই বলেছেন। 'কৃষ্ণপদদাসী' একথাটিই শ্লোক-ব্যাখ্যার মূলসূত্র। শ্রীরাধারাণী 'কৃষ্ণপদদাসী' ভাবের আবেশেই এসব কথাগুলি বলেছেন। দাসীর ধর্ম স্বীয় প্রাণনাথকে সেবা করে সুখী করা। নিজসুখের প্রতি লক্ষ্য থাকলে দাসীর সেবা কখনই প্রাণনাথের সুখকর হয় না। তাই শ্রীমতী বলছেন — 'সখি! আমি যে তাঁর শ্রীচরণ-সেবিকা দাসী। আমি তাঁর প্রতি কি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করতে পারি? আমায় উপেক্ষা করে যদি তাঁর আনন্দ হয়, তবে তা'তেই তো আমার সুখ হওয়া উচিৎ। তাঁকে উপেক্ষা করার

Scanned with CamScanner

যে কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ তাঁর সুখবিধানই তো আমার কর্তব্য সখি !

বিশেষতঃ সখি ! তিনি রসরাশি ও সুখরাশি বা আনন্দের রাশি। (শ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন — "রসো বৈ সঃ" "আনন্দং ব্রহ্ম" "রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি)" সুতরাং তাঁর সব চেষ্টাতেই যে রস বা আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়। কেউ যদি তাঁর চেষ্টায় দুঃখ পায়, সেটি তা'র নিজেরই প্রকৃতির দোষ বলে জানতে হবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যখন রস বা আনন্দ-ছাড়া আর কিছুই নেই, তখন তাঁর কোন চেষ্টাতেই কারো দুঃখ পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।' তাৎপর্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দস্বরূপ, তাঁর আনন্দলাভের নিমিত্ত বাইরের কোন বস্তুরই প্রয়োজন নেই। একমাত্র হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি প্রেমই তাঁর চিত্তে আকাঙক্ষা জাগাতে সক্ষম। তিনি কেবল প্রেমরসাস্বাদন-লোলুপ, এটী তাঁর স্বরূপগত ধর্ম। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী, সুতরাং সেই মূর্তিমান্ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে তিনিই শৃঙ্গার-রসাস্বাদনের অফুরন্ত বাসনা জাগিয়ে নিত্যকাল তাঁকে রসলোলুপ করে রেখেছেন। শ্রীরাধারাণীর প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনাদি সবই সেই রসিকশেখরের রসলোলুপতা ভিন্ন আর অন্য কিছুই নয়।

যা' হোক, শ্রীমতী বল্লেন — 'সখি ! সেই রসসুখরাশি কৃষ্ণ আমায় আলিঙ্গনদ্বারা আত্মসাৎই করুন, কিম্বা আমায় দর্শন না দিয়ে আমার দেহ-মনকে দগ্ধই করুন, তিনিই আমার

Scanned with CamScanner

প্রাণনাথ। যেহেতু আমি যখন তাঁর দাসী, তখন তাঁর যাতে সুখ হয়, তাতেই আমার সুখী হওয়া উচিৎ।

হে সখি! আমার মনের দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা তোমাদের বলি শোন — আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি অনুরাগই প্রকাশ করুন বা দুঃখ দিয়ে আমায় মেরেই ফেলুন — তিনিই তো আমারই প্রাণেশ্বর, তিনি তো অন্য কেউ নন।' শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধা-রাণীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতেও পারেন বা আবার প্রাণান্তক দুঃখও দিতে পারেন, পরবর্তি ত্রিপদীতে তাই বলছেন —

"ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন,
মোর সৌভাগ্য-প্রকট করিয়া।
তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥"

শ্রীমতী বলছেন — "সখীগণ! এই ব্রজের বহু রমণীরই তিনি বল্লভ, আমার ন্যায় অনেক গোপরমণীরই তিনি প্রাণনাথ। তবু তিনি আমায় সর্বাধিক প্রীতি করেন, এটী তাঁর বহু লীলা-তেই প্রমাণিত। সুতরাং তিনি অন্য সব প্রেয়সীকে উপেক্ষা-করত তাঁর দেহ ও মন একান্তভাবে আমার বশীভূত করে

Scanned with CamScanner

আমার সৌভাগ্য-প্রকাশপূর্বক অন্যান্য নারীগণকে দেখিয়ে তাদের সম্মুখেই নিরন্তর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করুন ও তাদের মনঃপীড়া দিন; কিম্বা লম্পট তিনি শঠতা, ধৃষ্টতা ও কাপট্য-প্রকাশপূর্বক আমার সম্মুখেই অন্যান্য ব্রজরমণীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করে আমায় যথেষ্ট মনঃপীড়া দান করুন — তবু যে তিনি আমার প্রাণনাথ।"

বস্তুতঃ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এ লাম্পট্য, শাঠ্য, ধৃষ্টতা, কাপট্য সবই রসময়। প্রেমসম্পুটে শ্রীরাধারাণীই দেবাঙ্গনা-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলেছেন —

"লাম্পট্যতো নবনবং বিষয়ং প্রকুর্ব্ব-
ন্নাস্বাদয়ন্নতিমদোদ্ধুরতাং দধানঃ।
আহ্লাদয়ন্নমৃতরশ্মিরিব ত্রিলোকীং
সন্তাপয়ন্ প্রলয়সূর্য্য ইবাবভাতি ॥" (৫৬)

"সখি! লাম্পট্যহেতু এই প্রেম প্রিয়তমকে নব নবরূপে আস্বাদন করায়ে থাকে এবং সাতিশয় মদাধিক্য-বিধান করে ত্রিলোককে চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদিত ও প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় সন্তাপিত করে দীপ্তিমান্ হয়।"

তাৎপর্য এই যে, বহু নায়িকায় নিষ্ঠা থাকায় নায়ক-প্রীতি ক্ষণে ক্ষণে নব নব নায়িকা প্রাপ্তির লালসায় উৎকণ্ঠা জাগিয়ে নব-নবভাবের আস্বাদনদানে নায়ককে উৎফুল্ল করে তোলে। নায়িকাপ্রীতিও অন্যত্রগত নায়কের অপ্রাপ্তিহেতু বিরহদশা প্রাপ্ত করিয়ে নায়িকাকে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিবিধ

Scanned with CamScanner

সম্ভোগের সুখ-স্বপ্ন প্রদান করে এক অভূতপূর্ব আস্বাদন-সাগরে নিমজ্জিত করে থাকে। চন্দ্র যেমন স্বীয় জ্যোৎস্নালোকে ত্রিভুবন সুশীতল করে, প্রেমও তদ্রূপ সম্ভোগবস্থায় নায়ক-নায়িকাকে অনির্বচনীয় আস্বাদন দান করে। তখন তাঁদের নিকট ত্রিভুবন আনন্দময় বলে প্রতিভাত হয়। আবার বিরহাবস্থায় সেই প্রেমই কোটি কোটি দাবানল-অপেক্ষাও যন্ত্রণাপ্রদ হয়ে প্রতিটি বস্তুকে জ্বালাময় বলে প্রতীয়মান করায়। প্রেম থেকে উদ্ভুত বলে এই জ্বালাও অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে থাকে ও ভাবী মিলনানন্দের বিপুল পরিপুষ্টি সাধিত করে। ব্রজের মধুর-প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় ব্রজকান্তাগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই এসব চমৎকারিত্ব জানতে হবে। শ্রীমতী আবার বল্লেন —

"না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তার হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥"

'সখি ! তিনি আমায় বহু মনঃপীড়া বা বহু দুঃখ দিলেও আমার প্রাণনাথ কেন, তা' বলি শোন। তিনি আমায় দুঃখ দিলেও আমি সে দুঃখ গণনা করি না। বস্তুতঃ সে দুঃখ আমার মনের নিকট কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। কারণ আমার দেহ-মন ও সর্বেন্দ্রিয় কেবল তাঁর সুখই কামনা করে থাকে। তাঁর সুখই যখন আমার একমাত্র কাম্য, তখন আমায়

Scanned with CamScanner

দুঃখ দিলে যদি তিনি মহাসুখী হন, তবে সেই দুঃখই আমার শ্রেষ্ঠতম সুখ বলে আমি মনে করি ।' গোপীপ্রেমের মহিমা-বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার ।
কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ।।
কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ।
কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ।।

.....

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত ।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ।।
'এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
তাঁর ধন — তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন ।।
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন-ভূষণ ।।
আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব ।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ।।
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন ।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটী গুণ ।।
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয় ।।
তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ।।

Scanned with CamScanner

এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান —
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ।।"
(চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিঃ)

শ্রীকৃষ্ণের সুখেই গোপীর সুখ পর্যবসিত রয়েছে। গোপী-গণকে সুখী করতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার প্রয়োজন। তাঁরা কৃষ্ণের সুখেই সুখী, কৃষ্ণের দুঃখেই দুঃখী। তাঁদের স্বতন্ত্র কোন সুখ বা দুঃখানুভূতি নেই। গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধাতে এই বৃত্তি সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত। তাই আবার বল্লেন —

"যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী ?
মুঞি তার পায়ে পড়ি লঞা যাঙ্ হাথে ধরি
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী ।।"

শ্রীকৃষ্ণ অন্য ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে সঙ্গ করলেও স্বরূপতঃ যে শ্রীরাধার দুঃখ হয় না, বরং সুখই হয়; তাই বলছেন — 'সখি ! শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন রমণীর রূপ-গুণে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত লালসান্বিত হন, অথচ সে রমণীর যদি শ্রীকৃষ্ণের মিলনেচ্ছা না থাকে; আমি সে রমণীর গৃহে গিয়ে তার পায়ে পড়ে তাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত সম্মত করাব এবং নিজে তার হাত ধরে এনে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাকে সমর্পণ করে আমার প্রাণবল্লভকে তার সঙ্গে ক্রীড়া করায়ে তাঁকে সুখী করব। তবু সে রমণীর অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখ প্রাণ থাকতে আমার প্রাণবল্লভকে সহ্য করতে দেবো না ।'

Scanned with CamScanner

শ্রীরাধারাণীর এই উক্তি তাঁর শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-ভাবনাময় অকৈতব বিশুদ্ধ প্রেমেরই উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে ! এই জাতীয় মহামাধুর্যময় মহাভাবাখ্য প্রেমের গাঢ়-বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই বশীভূত হয়ে থাকেন এবং এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি শ্রীরাধাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে মহাজন লিখেছেন —

"নয়ান-পুতলী রাধা মোর।
মন-মাঝে রাধিকা উজোর ॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়।
গগনেহ রাধিকা উদয় ॥
রাধাময় ভেল ত্রিভুবন।
তবে আমি করিব কেমন ॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী।
না দেখি ধৈরজ হৈতে নারি ॥
এ যদুনন্দন-মনে জাগে।
কি না করে নব অনুরাগে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রৈণ-পুরুষ নন — তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম ও স্বয়ং ভগবান্। বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকভাবনাময় প্রেম-ব্যতীত তাঁর চিত্তে এতাদৃশ আলোড়ন জাগানো সর্বথাই অসম্ভব ! একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধার নিমিত্তই তাঁর এতাদৃশ উন্মাদনাময় উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধার এ বিশুদ্ধ প্রেমমাধুরী সর্বথা ভাব, ভাষা ও মানবীয় চিন্তার অতীত বস্তু।

Scanned with CamScanner

শ্রীরাধারাণীর এই উক্তিতে প্রশ্ন জাগতে পারে — যদি অন্য রমণীর সঙ্গলিপ্সু শ্রীকৃষ্ণের বাসনা তিনি সেই রমণীকে সেধে তার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করিয়ে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন; তবে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করলে শ্রীরাধারাণী মান করেন কেন ? এজাতীয় প্রশ্নের সম্ভাবনাতেই বল্লেন —

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে ।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে ।।
সেই-নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ।
নিজসুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ।।"

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নায়িকার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ গমন করলে যে শ্রীরাধারাণী মানিনী হন, এরও মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণকে মানের বিচিত্র রসমাধুরী আস্বাদন করানো । মানের লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে —

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ ।
স্বাভীষ্টশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে ।।" (উঃ নীঃ ১৫।৭৪)

"নায়ক-নায়িকার একত্রই অবস্থান হচ্ছে, একের প্রতি অন্যের অনুরক্তিও রয়েছে, একে অপরকে দেখতে এবং আলিঙ্গন

Scanned with CamScanner

করতেও ইচ্ছুক, অথচ যে ভাববিশেষ এই অভীষ্টসিদ্ধির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, তারই নাম **'মান'** ।" এই বিরোধ আপাত-দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার ক্লেশকর বলে অনুমিত হলেও এর ফলে প্রেম বৃদ্ধি পায়, কেবল বৃদ্ধিই নয় — প্রেম নব-নবায়মান হয়ে ওঠে। প্রেমের প্রবাহকে অধিকতর স্বচ্ছ, সবেগ ও অভিনব করে তোলার জন্যই মানের উদ্ভব হয় ! নিয়ত আস্বাদ্য-বস্তুকে অভিনব-মাধুর্যে সুমধুর ও প্রলোভনীয় করে তুলতে মান অদ্বিতীয় ! সুতরাং প্রেমের রাজ্যে মান এক সঞ্জীবনী সুধা — একটি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল !! এর উদয়ে নায়িকার সৌন্দর্য-মাধুর্য-রূপ-রসাদি নায়কের পলকে পলকে অভিনব বলে মনে হয়। মকরন্দ-লোলুপ-ভৃঙ্গের ন্যায় নায়ক মানিনীর মুখকমল-মধু-পানের জন্য ব্যাকুলিত হয়ে পড়েন। হৃদয়ের ঘোরতর তিমির নাশের জন্য নায়িকার 'দন্তরুচিকৌমুদীর' প্রার্থনায় আকুলিত হন। অবশেষে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বলে মানিনীর চরণতলে নিজ মস্তক লুণ্ঠিত করে ধন্য হন ! নায়িকার সরোষ-বচনামৃত নায়ককে বেদস্তুতি-অপেক্ষাও সমধিক আনন্দ-প্রদান করে থাকে।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধারাণী বল্লেন — 'সখি ! মানিনী কান্তার রোষ শ্রীকৃষ্ণকে অপার আনন্দ দান করে। মানিনীর তাড়ন-ভর্ৎসনে তাঁর বিপুল সন্তোষ লাভ হয়। তাই তাঁকে মানরসের সুখভোগ

Scanned with CamScanner

করিয়ে অল্প চেষ্টাতেই মানিনীর মানভঙ্গ হয় । আর শ্রীকৃষ্ণের মর্মব্যথা জেনেও যে রমণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ পোষণ করে থাকে, নিজের সুখের প্রতিই যার লক্ষ্য; তার মাথায় বাজ পড়ুক । অর্থাৎ তাকে শত শত ধিক্কার । কৃষ্ণকান্তা গণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের প্রতিই লক্ষ্য থাকা উচিৎ ।' শ্রীরাধারাণী যে শ্রীকৃষ্ণের সুখই চান, অপর কিছুই তাঁর কাম্য নয় — এটিই আবার বিশেষভাবে বলেছেন —

"যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ।।
কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি-লাগি কৈল বেশ্যার সেবা ।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইলে মৃতপতি,
তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা ।।"

'সখি ! কোন গোপী যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ করে থাকে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-সাধন করে এবং শ্রীকৃষ্ণও তাকে অভিলাষ করেন; শ্রীকৃষ্ণের সে সুখসাধন-সামগ্রী বলে আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণা হলেও আমি তাকে আমার প্রাণা-পেক্ষা প্রিয় বলে মনে করব । সে গোপীর ঘরে গিয়ে যদি তার দাসী হয়ে আমি তার সেবা করতে পারি; তা'হলেই আমার অধিকতর সুখ বা আনন্দলাভ হয় ।' শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যযুক্ত

Scanned with CamScanner

প্রেম প্রভাবেই নিজের দিক্‌টি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ কিসে সুখী হন, এই চিন্তায় তন্ময় হওয়ার নামই **প্রেম**। যিনি তন্ময়, তাঁর আর অন্য বস্তুর অনুভূতি কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে আনন্দ বা রসাস্বাদনের যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাসনাসমূহ জাগরিত হয় — তার পরিপূর্তির উপাদান দিয়েই গোপীদেহ গঠিত ! শ্রীরাধারাণীতে এই বৃত্তি সর্বাধিক পরিস্ফুট ! তাই তাঁর তৎসুখকামতা" "স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ" ইত্যাদি। শ্রীমতী রাধারাণী অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা করেন —

"স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদেগাষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে,
যদ্যল্পাপি ক্ষতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্ত্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদিচেত্তত্র বাসং করোতু ॥"

(উঃ নীঃ-১৩৪)

ব্রজ থেকে মথুরায় আগমনকালে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীরাধা-রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'হে রাধে ! তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে তোমার কি সন্দেশ উপহার দিব ?' শ্রীরাধারাণী বল্লেন — 'হে উদ্ধব ! শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করলে যদিও আমাদের সুখ হয় বটে, তবু তা'তে যদি তাঁর কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনো না আসেন। যদিও তাঁর বিরহে আমাদের গুরুতর পীড়া হয়, কিন্তু মথুরাবাসে যদি তাঁর সুখোদয় হয় — তিনি চিরকাল সেখানেই বাস করুন।' আবার

Scanned with CamScanner

নিজদেহের ক্ষিতি, জলাদি পঞ্চভূতদ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সেবা বা সুখের সম্ভাবনা থাকে, তবে শ্রীমতী মরণ-কামনা করেও শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করতে ইচ্ছা করেন —

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত ।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ ।
ঐছে মিলই যর গোকুলচন্দ ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত ।
মঝু অঙ্গ তাঁহি হোই মৃদুবাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম ।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি ।
সো রসময় তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥" (পদকল্পতরু)

যদিও এবিশ্বে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসেবার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু এবিষয়ে শ্রীরাধারাণী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এক বিপ্ররমণীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন । কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এক বিপ্রের পরম পতিব্রতা এক পত্নী ছিলেন । নিষ্ঠা-সহকারে

Scanned with CamScanner

পতিসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত । দৈবাৎ এক রূপবতী বেশ্যাতে সেই বিপ্রের অতিশয় আসক্তি জন্মে । তিনি পত্নীর নিকট তাঁর মনের কথা খুলে বলেন এবং বেশ্যার সঙ্গ করার নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন । পতির অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত পতিব্রতা বেশ্যার নানাপ্রকার সেবা করে তাকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর পতির অভিলাষ বেশ্যার নিকট জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পতিব্রতার স্বামী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত জেনে বেশ্যা তাঁর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করে নি । তবে রাত্রিকালে পতিব্রতা যদি তাঁর স্বামীকে বেশ্যার গৃহে আনয়ন করেন, তবে পতিপরায়ণার গুণমুগ্ধা বেশ্যা তাঁকে কেবল দর্শন দিতে রাজী হয়। বিপ্র বেশ্যার প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, তাকে তিনি নয়নভরে দেখলেও যেন নিজেকে ধন্য মনে করেন । সুতরাং পতিব্রতা চলচ্ছক্তিহীন সেই বিপ্রকে স্কন্ধে বহন করে রাত্রিকালে সেই বেশ্যালয়ে গমন করেন । পথিমধ্যে মার্কণ্ড মুনি শূলের উপর বসে তপস্যামগ্ন ছিলেন । দৈবযোগে সেই বিপ্রের স্পর্শে মুনির ধ্যানভঙ্গ হয় । তখন মুনি কোপান্বিত হয়ে অভিশাপ দেন যে, যার স্পর্শে তাঁর সমাধি-ভঙ্গ হয়েছে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটবে ।

পতিব্রতা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পতির মৃত্যুরূপ মুনি-অভিশাপ শ্রবণে স্তম্ভিত হন । বিশেষতঃ তাঁর স্বামী অপূরণীয় আকাঙক্ষা নিয়ে মরবেন — এ কখনই হতে পারে না । অথচ মুনির অভিশাপ কিছুতেই মিথ্যাও হতে পারে না । তাই পতি-ব্রতাও প্রতিজ্ঞা করলেন — তিনি যদি পতিব্রতা হন, তবে সূর্য

Scanned with CamScanner

কখনই উদিত হতে পারবেন না। পতিব্রতার পাতিব্রত্যের প্রভাবে সূর্যের গতি স্তম্ভিত হল। সূর্যের গতি স্তম্ভিত হওয়ায় বিশ্ব-নাশের উপক্রম হল জেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই তিন দেবতা এসে পতিব্রতাকে বুঝালেন যে, তাঁর পাতিব্রত্য-প্রভাবে সূর্যের গতি স্তম্ভিত হওয়ায় বিশ্বনাশের উপক্রম হয়েছে, তিনি সূর্যোদয় হতে দিন; একবার তাঁর পতির মৃত্যু হোক, মুনি-বাণী সত্য হোক; তারপর তাঁরা তাঁর পতিকে বাঁচিয়ে দেবেন। পতিব্রতা তাঁদের কথায় সম্মত হলে সূর্য উদিত হলেন। বিপ্রের মৃত্যু হল। তারপর সেই তিন দেবতার কৃপায় বিপ্র পুনরায় প্রাণ পেলেন এবং তাঁদের অমৃতদৃষ্টি-প্রভাবে তাঁর দেহের কুষ্ঠ ও মনের দুষ্টতা আর থাকল না। মায়ার জগতেই যদি এরূপ নিষ্কাম প্রিয়সেবা সম্ভবপর হয়, তবে সেই চিন্ময় প্রেমরাজ্যের আর কথা কি। তারপর শ্রীমতী রাধারাণী বল্লেন —

"কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥"

'সখি ! কৃষ্ণ আমার জীবন, তিনি আমার প্রাণধন, এমনকি তিনি আমার কোটি প্রাণেরও প্রাণ। প্রাণ সুখী হলেই যেমন দেহেন্দ্রিয়াদি অনায়াসে সুখী হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ সুখী হলেই আমি সুখী। এছাড়া আমার আর পৃথক্ সুখের সত্তা কিছুই নেই। প্রাণ তো হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকে, তাঁকে তো

Scanned with CamScanner

আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাখা সম্ভব নয়; তাই তাঁকে অন্ততঃ হৃদয়ের উপরে সর্বদা ধরে রাখব এবং নিরন্তর সেবা করে সুখী করব — এই আমার সর্বদার চিন্তা; এই একমাত্র অভীষ্ট বা চিরকাম্য ।' শ্রীরাধারাণীর উক্তিতে মহাজনও বলেছেন —

'বঁধু, তোমার গরবে- গরবিনী হাম-
রূপসী তোমার রূপে ।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে ।।
আনের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবল তুমি ।
আমার পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ।।
বঁধু, শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি ।
সখীগণ মানে জীবন-অধিক
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ।।
আমার নয়নের অঞ্জন অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া-চাঁদা ।
জ্ঞানদাস কহে — কালিয়া-পিরিতি
আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা ।।" (পদকল্পতরু)

প্রশ্ন হতে পারে — শ্রীরাধারাণীর যদি দাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ব্যতীত অন্য কিছুই ধ্যানের বিষয় না থাকে,

Scanned with CamScanner

বা নিজের কিছুই সুখানুসন্ধান না থাকে; তবে তিনি দাসীভাবে সর্বদা কৃষ্ণের সেবা করলেই তো পারতেন; কান্তাভাবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন কেন ? তদুত্তরে বল্লেন —

"মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ্ দান ।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী' অভিমান ।।"

'হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমার সুখ, সেবার উদ্দেশ্য সেব্যের সুখবিধান; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানই আমার একমাত্র লক্ষ্য । তিনি আমার এই দেহটি ভোগ করে আনন্দ পান, তাই আমি এদেহ তাঁকে দান করেছি । তিনি আমায় কান্তা বলে মনে করেন এবং সতত আমায় 'প্রাণেশ্বরী' বলেন । আমার কিন্তু নিজেকে তাঁর প্রাণেশ্বরী বলে অভিমান হয় না । "আমি কৃষ্ণদাসী" এই আমার চির-অভিমান । কৃষ্ণপ্রেমের এই একটি স্বরূপসিদ্ধধর্ম যে, কৃষ্ণপ্রেম সকলকেই দাস্যাভিমান প্রদান করে থাকে । "কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব । গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ।।" (চৈঃ চঃ)। আবার কৃষ্ণদাসাভিমানে যে আনন্দ, কোটি ব্রহ্মসুখও তার নিকট তুচ্ছীকৃত । "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু । কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ।।" (ঐ) । তাই অন্যের কথা দূরে থাক, আজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীরাধার ভাবকান্তি নিয়ে দাসভাবে নিজ মাধুর্যাস্বাদনে মগ্ন ! শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই

Scanned with CamScanner

শ্রীরাধারাণী তাঁর সঙ্গে মিলন-বিহারাদি করে থাকেন, বস্তুতঃ সঙ্গম-সুখাপেক্ষা সেবাসুখের প্রতিই তাঁর বিশেষ লক্ষ্য । তাই বল্লেন —

"কান্তসেবা সুখপূর সঙ্গম হৈতে সুমধুর
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি তভু পাদসেবায় মতি
সেবা করে দাসী-অভিমানী ।।"

'সখি ! কান্তের সেবাই শ্রেষ্ঠ সুখ, যা' সম্ভোগানন্দ-অপেক্ষাও অধিক আস্বাদ্য বা সুমধুর । এর দৃষ্টান্তই বৈকুণ্ঠের রমাদেবী । তিনি শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী হয়েও দাসী-অভিমানে সতত শ্রীনারায়ণের পাদসম্বাহনাদি সেবাতেই নিরতা ।' আসলে বৈকুণ্ঠেশ্বরী কমলাদেবী-অপেক্ষা ব্রজকান্তা-গণের শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ বহু উচ্চকোটির ও পরম রসমধুর । কিন্তু লৌকিক-লীলায় বা নরলীলায় শ্রীরাধারাণী ও গোপীগণ নিজে-দের সামান্যা মানবী বলেই অভিমান করে থাকেন, এতেই নর-লীলার সুচারুতা সম্পন্ন হয়ে থাকে । তাই শ্রীরাধারাণী কান্ত-সেবায় এখানে রমণীগণের আদর্শ-স্থানীয়া রমাদেবীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন । বস্তুতঃ রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লালসায় প্রলুব্ধ হয়ে শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণসেবা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসে তপস্যা করেও শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা লাভ করতে সক্ষম হন নি । তারপর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বল্লেন —

Scanned with CamScanner

"এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায় ।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায় ।।
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ ।।"

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" এশ্লোকের আস্বাদনী **'আমি কৃষ্ণপদদাসী'** থেকে **'সেবা করে দাসী-অভিমানী'** পর্যন্ত শ্রীরাধারাণীর উক্তি । যেসব বাণীতে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনা-হীন শ্রীকৃষ্ণসুখৈকভাবনাময় বিশুদ্ধ বা নিরুপাধি প্রেমের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশিত হয়েছে । শ্রীরাধারাণীর ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাই আস্বাদন করলেন । এই বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই গৌর-অবতার । ব্রজলীলায় বিষয়তত্ত্বরূপে যে সুনির্মল রাধাপ্রেমের মাধুরী দর্শন করে স্তম্ভিত বা হতবাক্ হয়েছিলেন এবং আশ্রয়তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার ভাবে ঐ প্রেমমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন; আজ গৌরলীলায় তাই আস্বাদনের বিষয়বস্তু হয়েছে । যেমন কোন বোঝা দেখলে তার গুরুত্ব বুঝা যায় না, কাঁধে নিলে তবেই বুঝা যায়, তদ্রূপ কৃষ্ণলীলায় যে ভাবের দর্শকমাত্র ছিলেন, আজ সে ভাবের গুরুত্ব বুঝেছেন, তাই ভাবে মন সর্বদা আলোড়িত; অশ্রু; কম্প,

Scanned with CamScanner

পুলক, বৈবর্ণ্যাদি সুদীপ্ত অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারে নিরন্তর শ্রীঅঙ্গ-ব্যাপ্ত। ভাবের প্রহারে দেহ, মন জর্জরিত — যেন আর দেহ, মনকে ধরে রাখা যায় না। এই রাধাভাবের আকর্ষণেই তিনি কূর্মাকৃতি। এই ভাবের বিকর্ষণেই তাঁর অস্থিসন্ধি-বিয়োগ ॥

জাম্বুনদে যে স্বর্ণ জাত হয়, তা'তে কোন খাদ নেই, তা' যেমনি খাঁটি, তেমনি মূল্যবান্। প্রেমের রাজ্যে আত্মসুখবাসনাই প্রেমের খাদ, ব্রজের প্রেম জাম্বুনদ-স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ অর্থাৎ আত্মসুখ-বাসনাগন্ধরহিত অতি সুনির্মল। বিশেষভাবে গোপীপ্রেম, সর্বোপরি রাধাপ্রেমে ঐ নৈর্মল্যের পরাকাষ্ঠা। এই বিশুদ্ধপ্রেমের লক্ষণ বিশ্ববাসীকে জানাবার জন্য প্রভু শিক্ষাষ্টকের এশ্লোকটি পাঠ করলেন এবং স্বয়ং শ্লোকার্থ পদ-নিবন্ধে আস্বাদন করলেন। **'সে প্রেম জানাইতে লোকে'** এবাক্যে শ্রীল কবিরাজ এই শেষ শিক্ষাশ্লোকে জগদ্‌বাসীর শিক্ষা যে **ব্রজপ্রেম** তাই জানাতে চেয়েছেন। এই ব্রজপ্রেমের সাধনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ ব্রজজনের রাগাত্মিকা ভক্তি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে তার আনুগত্যময় **রাগানুগা**-ভজনে তাদের প্রবর্তিত করেছেন। শুদ্ধভক্তি দ্বিবিধ — **বৈধী** ও **রাগানুগা**।

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ-১।২।৬)

Scanned with CamScanner

"সাধারণতঃ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি-বিষয়ে কোথাও লোভ, কোথাও বা শাস্ত্রশাসন প্রবর্তক হয়। যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হয়ে শাস্ত্রশাসনই প্রবর্তক হয়ে থাকে, তাকে **বৈধীভক্তি** বলা হয়।" 'ভগবদ্ভজন না করলে নরকাদি ভোগ ও নানা যোনীতে ভ্রমণ-করত সংসার-যন্ত্রণা প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী' — ইত্যাদি শাস্ত্রবাণীই যেখানে ভজনের প্রবর্তক হয় — তারই নাম বৈধীভক্তি।

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥"
(ঐ-১।২।২৭০)

"ব্রজবাসী নিত্যপার্ষদগণে প্রকাশ্যভাবে বিরাজিত ভক্তির নাম 'রাগানুগাভক্তি', এই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকেই **রাগানুগা** ভক্তি বলা হয়।" 'রাগাত্মিকা' ভক্তি 'সম্বন্ধাত্মিকা' ও 'কামাত্মিকা' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রজের রক্তক, পত্রকাদি দাসগণ, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাগণ এবং নন্দযশোদাদি মাতা-পিতাগণে 'সম্বন্ধাত্মিকা' এবং শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণে 'কামাত্মিকা' ভক্তি নিত্য বিরাজিত। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ববিচারে সম্বন্ধাত্মিকা-অপেক্ষা মধুররসময়ী কামাত্মিকা ভক্তির পরম উৎকর্ষ। এই কামাত্মিকা আবার দ্বিবিধ — 'সম্ভোগেচ্ছাময়ী' ও 'তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা'। সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকাভাব এবং তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীভাব। সুতরাং রাগানুগাভক্তিও 'সম্বন্ধানুগা' ও 'কামানুগা' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রজের দাস, সখা ও মাতা-পিতার আনুগত্যময়ী ভক্তিকে

Scanned with CamScanner

'সম্বন্ধানুগা' ও ব্রজগোপীগণের আনুগত্যময়ী ভক্তিকে 'কামানুগা' বলা হয়। এই কামানুগার তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীভাবের মধ্যে শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যময়ী **মঞ্জরীভাব-সাধনাই** শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান। ইহাই শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের আচরিত ও প্রচারিত ব্রজরসের সাধনা। এই **মঞ্জরীভাবেই রাগানুগা-ভজনের চরমোৎকর্ষ বিরাজিত**। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সাধ্যতত্ত্ব এই মঞ্জরীভাব।

"বাহ্য অন্তর — ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্য — সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
মনে — নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥" (চৈঃ চঃ)

এই রাগানুগামার্গের সাধক বাহ্য বা সাধকদেহে ব্রজবাস-পূর্বক (যথাবস্থিত দেহে ব্রজবাসে অসমর্থ হলে মনে মনে ব্রজবাস-করত) শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের আনুগত্যে তাঁদেরই আদর্শ লক্ষ্য করে শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দনাদি ভজন করবেন। আর নিজ সিদ্ধদেহে অর্থাৎ শ্রীগুরু-প্রদত্ত স্বীয় সিদ্ধ-দেহ বা মঞ্জরীস্বরূপ চিন্তা করে শ্রীব্যপমঞ্জর্য্যাদির আনুগত্যে মনে অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলা ও তাঁদের কালোচিত সেবা ভাবনা করবেন। সততই তাঁদের মনে প্রাণে এই লালসা জাগরিত হবে —

Scanned with CamScanner

"রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কুলে কেলি-কদম্বের বন ।
রতন-বেদিরোপরে বসাব দু'জন ॥
শ্যামগৌরী — অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস ।
নরোত্তমদাস করে সেবা-অভিলাষ ॥" (প্রার্থনা)

এই অভিলাষ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের জীবনভরা । এই অভিলাষ বুকে নিয়ে তাঁরা অনুরাগময় ভজনজীবন-যাপন করে এই জড়দেহের অবসানে স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে লীলারাজ্যে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ-সেবা লাভ করে ধন্য বা কৃতার্থ হবেন । জয় শ্রীগৌরহরি ! জয় শ্রীরাধে !! ॥৮॥

Scanned with CamScanner